বাংলা নাটকের পর্বান্তর

স্বাধীনভাবে পথ চলতে শুরু করে বাংলা নাটক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে উপস্থিত। দীর্ঘ এই পথ চলায় বাংলা নাটকের গতিস্রোত বিস্তৃতি লাভ করেছে, একই সঙ্গে নানা বৈচিত্র্যের সংযোজন ঘটেছে। কালে কালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা নাটকের উত্তরণ ঘটে। এই সময়কার যে সকল নাট্যকার বাংলা নাটকের গতিকে ত্বরান্বিত করতে অগ্রণী ভূমিকার পথিকৃৎ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম নাটককার হলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। নাটকের বিষয় বৈচিত্র্য, জীবনদর্শন, শিল্পভাবনা প্রভৃতি বিষয়কে তিনি স্বতন্ত্র ধারায় চালিত করেছেন। এই স্বতন্ত্র ধারার সূত্রপাত হঠাৎ করে শুরু হয়নি। বাংলা নাটক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এই স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। তার এক বৃহৎ পরিব্যাপ্ত ইতিহাস রয়েছে। "মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক : জীবন ও শিল্প" বিষয়ক আলোচনার পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে বাংলা নাটকের এই বৈচিত্র্যময় সুবৃহৎ ইতিহাস সংক্ষেপে পর্যালোচনার প্রয়াস রয়েছে এই অধ্যায়ে।

উৎস সূত্রে নাটক বিনোদনের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট অনুকরণমূলক শিল্পকলা। ক্রমান্বয়ে এই উদ্দেশ্যের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে। নাটক একই সঙ্গে আনন্দ বিনোদনের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক জীবন সমস্যা ও সমাধানের বার্তাবাহক হিসেবে অন্যতম প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে। সাহিত্য সমাজের দর্পণ, নাটক তার প্রত্যক্ষ মাধ্যম। সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। সমাজের সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে দর্পণস্বরূপ নাটকও বদলে যায়। উৎসলগ্ন থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত অতিক্রান্ত বাংলা নাটকের সুদীর্ঘ ইতিহাসের রূপরেখা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বাংলা নাটকের পর্বান্তর ঘটেছে বার বার। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা। ১৮২৫ সালে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন, ডিরোজিও ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলন। ১৮২৯ সালে রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা রদ আইন পাশ। ১৮৩১ এ

বাঙালি দ্বারা সৌখিন রঙ্গালয় স্থাপন। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ, ১৮৬০ সালের নীলবিদ্রোহ, ১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা ও বঙ্গদর্শন পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। ১৮৭৬ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন পাশ। ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিচ্ছেদের পরিকল্পনা, ১৯১৪-১৯১৯ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৩৯-১৯৪৫ এর প্রাণঘাতী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও জাপানের হিরোসিমা নাগাসাকি শহরে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতের বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ। ১৯৫০ এর মন্বন্তর এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিভিন্ন নাট্য আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনার অভিঘাতে ভীষণভাবে প্রভাবিত বাংলা নাটক। শুধু আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট নয় নাটকের পর্বান্তর বিভাজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে রঙ্গালয়, নাটকের আঙ্গিক, চরিত্র চিত্রণ, নাট্যকারের জীবনদর্শন। বাংলা নাটকের উদ্ভব কাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত নাটকের এই দীর্ঘ ইতিহাসকে আলোচনার সুবিধার জন্য চারটি পর্বে বিভাজিত করে আলোচনা করা গেল।

প্রথম পর্ব: ১৮৫২ সালের পূর্ববর্তী নাটকের পরিচয়, যেখানে বাংলা নাটকের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। নাট্যলক্ষণাক্রান্ত বিষয়ের প্রাধান্য রয়েছে মাত্র, শিল্পরূপ নিয়ে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি- যা যাত্রা, পাঁচালি, গীতাভিনয় প্রভৃতি অনুষঙ্গে এবং সংস্কৃত নাটকের অনুবাদমূলক রচনায় সীমাবদ্ধ। যদিও সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলা নাটক কখনো সংস্কৃত, ইংরেজি ও অন্যান্য পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন- একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। বাংলা নাটকে কোনো না কোনো ভাবে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাব বিদ্যমান।

দ্বিতীয় পর্ব: ১৮৫২ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্-কাল পর্যন্ত বাংলা নাটক যেখানে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে প্রসারিত। সৌখিন রঙ্গালয় ও পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের সৌজন্যে নাটক মঞ্চায়নমুখী। নাটকের আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তুলনামূলক অনেক কম।

তৃতীয় পর্ব: বাংলা নাটকের ধারায় রবীন্দ্রনাথ একক ও অনন্য। বাংলা নাটক নিয়ে তিনি নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। নাট্য আঙ্গিক, চরিত্রচিত্রণ, জীবনদর্শন ও বিষয় ভাবনা তাঁর হাতে ভিন্ন মাত্রা পায়। তিনি নাটকের বিশ্বায়ন ঘটিয়েছেন।

চতুর্থ পর্ব: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিভিন্ন নাট্য আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রচিত বাংলা নাটক ও নাট্যকার এই পর্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়। পর্বান্তর বিভাজনের যথার্থতা আলোচনাপূর্বক পর্বগুলির সার্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমগ্র বাংলা নাটকের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরার প্রয়াসে এই অধ্যায়ের অবতারণা।

প্রথম পর্ব: ১৮৫২ সালে জি. সি. (যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত) রচিত 'কীর্তিবিলাস' নামক মৌলিক নাটক নিয়ে বাংলা নাটকের পর চলা শুরু একথা ইতিহাস মতে সত্য। কিন্তু ১৮৫২ সালের পূর্বেও বাঙালি দ্বারা বাংলা নাটক চর্চার তথ্য দিয়েছেন সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা এবং নাট্য গবেষকগণ। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' এর ১৭ নম্বর চর্যায় রয়েছে– 'নাচন্তি বাজিল গান্তিদেবী। বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।।' এর থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন বুদ্ধদেবের জীবনের কোন কোন অংশকে নাটকীয় রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টার কথা। এছাড়াও বুদ্ধ নাটকের পাশাপাশি তৎসম্পর্কিত নৃত্যগীত ও নটপেটিকা অর্থাৎ অভিনেতাদের পোশাক-পরিচ্ছদ রাখার বাক্সের কথা জানা যায়। নৃত্যগীতের সঙ্গে যে নাটকের যোগ রয়েছে একথার প্রমাণ মেলে–

> " 'নৃৎ' ধাতু হইতে 'নাটক' এই কথাটির সৃষ্টি ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। নৃত্য হইতে ভারতীয় নাটকের জন্ম এই মত ওল্ডেনবার্গ প্রভৃতির সহিত কিথ সাহেবও পোষণ করিয়াছেন।"[১]

প্রাচীনকালে ধর্মানুষ্ঠানে নৃত্যগীত ইত্যাদির দ্বারা মানুষ তার অনুকরণ প্রচেষ্টাকে রূপায়িত করে। এই অনুকরণ করার সহজাত প্রবৃত্তি থেকে নাটকের সৃষ্টি। গ্রিসে প্রথম নাটকের সৃষ্টি Dionysus নামক দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে। প্রাচীন ভারতীয় নাটকের মূলও ধর্মের মধ্যেই নিহিত ছিল। কথিত আছে প্রজাপতি ব্রহ্মা নাট্যবেদ নামে পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন এবং এই নাট্যবেদের শিক্ষার ভার দেন তার প্রিয় শিষ্য ভরতমুনিকে। তাঁরই দ্বারা নাট্যবেদ জগতে প্রচার লাভ করে।

বাংলা সাহিত্যে নাটকীয় অঙ্কুরের প্রথম বিকাশ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়কে কেন্দ্র করে। এই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে তৎকালীন সমাজের গীতাভিনয়, পাঁচালি, যাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে বাঙালিরা নাটকীয় রস আস্বাদান করতেন। অন্যান্য দেশের লোক ঐতিহ্য থেকে নাটকের সৃষ্টি হলেও বাংলা নাটক তার থেকে ব্যতিক্রম। বাংলার লৌকিক ঐতিহ্য নাটক দ্বারাই উপকৃত হয়েছে। বাঙালির নাটক চর্চার অনুপ্রেরণা লাভের উপায় হিসেবে উন্মোচিত ছিল সংস্কৃত নাটকের বৃহৎ জগৎ। অবশ্য একথা ঠিক যে বাংলা ভাষা উদ্ভবের পূর্বে বাঙালির দ্বারা সংস্কৃত ভাষা ও অন্যান্য ভাষায় সাহিত্য চর্চার পরিচয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ। যদিও বাংলা ভাষা উদ্ভবের অনেক পরে বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক রচনার সূত্রপাত ঘটে। বিশেষ করে বাংলা নাটকের চর্চা শুরু হয় সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের অনুবাদ, অনুকরণ এবং বিদেশি রঙ্গমঞ্চের রূপসজ্জার আকর্ষণে। অবশ্য বাংলার সমাজ পটভূমিকায় আগে রঙ্গমঞ্চ এবং পরে রঙ্গমঞ্চের অভিনয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য অভিনয় উপযোগী নাটকের সন্ধান। সেই সূত্রেই সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের অনুবাদ কর্মের মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকের প্রাথমিক পর্বের সূত্রপাত ঘটে। অনুবাদমূলক নাটকের পরিচয় নেওয়ার আগে এখানে উল্লেখ বাঞ্ছনীয় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নাটকীয় গুণসম্পন্ন সাহিত্যের পরিচয় লাভ করা।

বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে তিনটি চরিত্র সংবলিত দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় কাব্যকাহিনি নাট্য আবেদনের সৃষ্টি করেছে। এ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> "বড়ু চণ্ডীদাস গ্রাম্য সমাজের জন্য তাঁহার কাব্য লিখিয়াছিলেন বলিয়া ইহার মধ্যে নাটকীয়তা আরও তীক্ষ্ণভাবে প্রকট হইয়াছে– ইহার কাব্যগুণকে ছাপাইয়া নাট্যগুণই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। তিনি নৌকাখন্ড, দানখন্ড প্রভৃতি সংঘাতমূলক আখ্যান সংযোজন করিয়া তাহার নাটকীয় আবেদনকে ঘনীভূত করিয়াছেন। নাটকের যে প্রধান লক্ষণ প্রত্যেক পাত্র পাত্রীর মুখে চরিত্রানুযায়ী ভাষার আরোপ– তাহাও রাধা কৃষ্ণ ও বড়াই এর সংলাপের মধ্যে চমৎকারভাবে উদাহৃত হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে শুধু কাব্য না বলিয়া গীতিনাট্য বা নাটগীতি বলাই অধিকতর সঙ্গত।"[২]

চৈতন্য ও চৈতন্য উত্তর যুগের সাহিত্যে নাটকীয় লক্ষণ বিশেষ ভাবে ধরা পড়ে। চৈতন্যদেব নিজেই একাধিকবার কৃষ্ণলীলা বিষয়ক অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন– একথা চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ থেকে জানা যায়। এছাড়া এই অভিনয় প্রেরণা থেকে নাটকের রূপকল্প উদ্ভুত হওয়ার জন্য এই সময় নাট্যাঙ্গিকের কিছু আদর্শ স্থির হয়েছিল। রূপ গোস্বামীর 'ললিতমাধব' ও 'বিদগ্ধমাধব' নামে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক দুটি নাটক এবং কবি কর্ণপুরের চৈতন্যলীলা বিষয়ক 'চৈতন্যচরিতামৃত' নাটক থেকে তা বোঝা যায়। পদাবলী সাহিত্যের পালা বিভাগ, নাটকের নায়ক-নায়িকার মানস অবস্থা অনুযায়ী পদবিন্যাস, মান- অভিমান বিষয়ক পদে উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক সংলাপের প্রাধান্য, সখী ও দূতীর মুখে তীক্ষ্ণ অভিযোগের আরোপ প্রভৃতি নাটকীয় পরিবেশের দ্যোতনা সৃষ্টি করে। এছাড়া মঙ্গলকাব্যের অভিনয় প্রবণতা, সুর সংযুক্ত আবৃত্তির দ্বারা রস সঞ্চারের প্রয়াস বাঙালির নাট্যকৌতূহলের পরিচয় দেয়। চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের আখ্যায়িকার সরল প্রবাহ ও ঘটনার ত্বরিত গতি বিশেষ কোন নাটকীয়

মুহূর্তের সৃষ্টি করে না, কিন্তু মনসামঙ্গলের চাঁদের সঙ্গে মনসার দ্বৈরথ সংগ্রাম ও বাসরঘরে সদ্য পতিহারা বেহুলার স্তম্ভিত করা দুর্ভাগ্য সুস্পষ্টভাবে নাটকীয় কল্পনাকে আলোড়িত করে। তারই ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে মনসামঙ্গলের কাহিনি নিয়ে নাটক রচিত হয়।

রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনির নাটকীয় আবেদন পরবর্তীকালে ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাট্যধারার প্রধান আধার হয়ে দেখা দেয়। বাংলা নাটকের উদ্ভবের পূর্বে বিদ্যাসুন্দর কাহিনির নাট্যরূপ পাওয়া যায় বাঙালির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সৌখিন নাট্যশালার অভিনয়ে। এছাড়া কবিগানের মধ্যে চরিত্রের সংলাপ ও গানের মাধ্যমে নাটকের উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ কবিগানের মূল বিষয় ছিল রাধা-কৃষ্ণ ও হর-পার্বতী লীলা কাহিনি। সুতরাং মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রত্যক্ষভাবে নাটকের পরিচয় পরিস্ফুট না হলেও নাটকের উৎস স্রোতকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের নাটকের উপাদান আধুনিককালে নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে গৃহীত হলেও প্রত্যেক জাতির লোক নাট্যের ন্যায় বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ বাঙালি জাতির লোকনাট্য থেকে না হয়ে বরং বিপরীত ঘটনা ঘটেছে। আধুনিক বাংলা নাটকের আদর্শ রূপের সূচনা হয়েছে বিলাতি ঐতিহ্যের দ্বারা।

আধুনিক বাংলা নাটক রচনার সূত্রপাত ঘটে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে হেরাসিম (গেরাসিম) লেবেডফ নামে এক রুশ দেশীয় মনীষীর হাতে। তিনি অধুনা বিলুপ্ত ২৫ নম্বর ডুমতলা স্ট্রীটে (বর্তমানে এজরা স্ট্রীট) 'Bengali Theatre' প্রতিষ্ঠা করেন এবং দুই ইংরেজি নাটক 'The Disguise' ও 'The Love is the Best Doctor' বাংলা অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করেন। দুই রাত্রি তাঁর অনূদিত 'কাল্পনিক সংবদল' নাটকটি অভিনীত হয়। ১৭৫৭ সালের ১৭ নভেম্বর প্রথম অভিনয়, দ্বিতীয় অভিনয় হয় ১৭৯৬ সালে ২১ মার্চ। দুর্ভাগ্যবশত এই মহামনীষীর নাট্যানুরাগ ষড়যন্ত্রের কারণে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। এই বিদেশী ভদ্রলোকের মহৎ

কর্ম ভস্মীভূত হলেও তাঁর সংকল্পিত মহৎ উদ্দেশ্য লালিত হতে থাকে তৎকালীন বিদেশি শাসকবর্গের অনুগ্রহপুষ্ট অভিজাত বাঙালি বাবু সম্প্রদায় কর্তৃক। তাঁদের আমোদ-প্রমোদ নিবারণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় শখের নাট্যশালা। ইংরেজি 'Theatre'-এর অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত এই সৌখিন নাট্যশালার অভিনয় উপযোগী নাটক সন্ধানের হাত ধরেই বাংলা নাটকের জয়যাত্রা সূচিত হয়। অবশ্য শখের নাট্যশালায় বাংলা নাটক অভিনয়ের আগে কিছু কিছু নাট্যকারের অনুবাদ নাটকের পরিচয় পাওয়া যায় যেগুলো কখনো কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়নি। ১৮৫২ সালের পূর্ব বাংলা নাটক পরিচয় নিম্নরূপ:-

১৮২২ সালে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কর্তৃক সংস্কৃত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের বাংলা অনুবাদ যাকে বাংলা নাটকের ইতিহাসে সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনূদিত প্রথম নাটক বলে মনে করা হয়। নাটকটির বাংলা অনুবাদক হিসেবে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গদাধর ন্যায়রত্ন ও রামকিঙ্কর শিরোমণি এই তিনজনের নাম পাওয়া যায়। ১৮২২ সালে 'হাস্যার্ণব' নামে একটি হাস্যরসাত্মক রচনার বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায় যার অনুবাদকের নাম কবি জগদীশ (পুরো নাম অজ্ঞাত), অনেকের মতে এটি বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিতীয় মুদ্রিত নাটক। ১৮২২ সালে সংস্কৃত থেকে 'ধূর্ত নাটক' ও 'ধূর্ত সমাগম' নামে বাংলায় দুটি প্রহসন অনূদিত হয়েছিল, কিন্তু প্রহসন দুটির পরিচয় ও অনুবাদক সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৮২৮ সালে গোপীনাথ চক্রবর্তীর সংস্কৃত রচনা 'কৌতুক সর্বস্ব নাটকম্' এর বাংলা অনুবাদ রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। নাটকটির কাহিনি দুই অঙ্কে বর্ণিত, গদ্য ও পদ্য সংলাপের ব্যবহার রয়েছে। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু থিয়েটার' বাঙালি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। যদিও এতে কোন বাংলা নাটক অভিনীত হয়নি, তবু বাংলা নাটকের ইতিহাসে এর গুরুত্ব কম নয়। এখানে নাটক দেখার

জন্য ইংরেজদের পাশাপাশি আমন্ত্রিত অভিজাত বাঙালিরা উপস্থিত ছিলেন। 'হিন্দু থিয়েটার' মঞ্চ দেখেই নবীন বসু তাঁর শ্যামবাজারের বাড়িতে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে। এই রঙ্গমঞ্চের প্রথম অভিনয় হয় 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক। এটাই ছিল বাঙালির উদ্যোগে প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয়। এতে নারী চরিত্রের অভিনীত হয় মহিলা অভিনেত্রী দ্বারা। নাটকের দৃশ্যগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য স্থান ও সময় অনুযায়ী অভিনয় করে দেখানো হয়। এই সখের নাট্যশালায় নাটকের অভিনয় কলকাতার মানুষের মধ্যে নাটকের অভিনয় স্পৃহাকে জাগিয়ে তোলে।

১৮৪৮ সালে রামতারক ভট্টাচার্য কালিদাসের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। অনুবাদটির মুদ্রণ প্রসঙ্গে বিশেষ তথ্য জানা যায় না। এ প্রসঙ্গে রয়েছে -

> "ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৪৮ সনের ২৮ শেষ জুন তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ইহার সম্পর্কে লিখেছেন– ' আমরা অত্যন্ত আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি, গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য গৃহের সুপাত্র ছাত্র শ্রী যুক্ত রামতারক ভট্টাচার্য কর্তৃক গৌড়ীয় গদ্য পদ্যে শ্রীমন্মহাকবি কালিদাস বিরচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নামক সুবিখ্যাত নাটক গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে, তদীয় ভূমিকা ও মঙ্গলাচার প্রভৃতি কিয়দংশ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম উৎকৃষ্টতর হইয়াছে, অপর উক্ত পুস্তক উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে জ্ঞানদর্পণ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে।..."[৩]

১৮৪৯ সালে নীলমণি পাল শ্রীহর্ষ রচিত 'রত্নাবলী' নাটকটি বাংলা অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। নাটকটি গদ্য-পদ্যের মিশ্র সংলাপে রচিত। নাটকের অভিনয় সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এছাড়া উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কিছু কিছু প্রহসন রচিত হয়েছিল। যেমন

দ্বারকানাথ রায়ের 'বিল্বমঙ্গল' (১৮৪৫), পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রমনী নাটক' (১৮৪৯) ও 'প্রেম নাটক' (১৮৫০) উল্লেখযোগ্য। এখানেই প্রাথমিক পর্বের বাংলা নাটকের পরিসমাপ্তি। দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত ১৮৫২ সালে জি. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' এবং তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটক রচনার মধ্য দিয়ে।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে প্রাথমিক পর্বের নাটক গুলি আধুনিক বাংলা নাটকের আঙ্গিক অবয়ব এর অনুসারী না হলেও বাংলা নাটক ক্ষেত্রে নাটকের বীজ বপনের সূত্রপাত ঘটেছিল এই পর্বে। যার ফলে দ্বিতীয় পর্বের বাংলা নাটক স্বর্ণযুগ আখ্যা লাভ করে। অবশ্য প্রথম পর্বে বাংলা নাটকের সংলাপ রচনায় তখনও পদ্য বিশেষত পয়ার-ত্রিপদীর প্রভাব অপ্রতিহত ভাবে চলেছিল। পদ্যের ছন্দ রচনায় ভারতচন্দ্রের রীতি আদর্শ হিসেবে গণ্য হত। কোন কোন কাহিনি উপস্থাপনায় মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুসরণ করে গণেশ বন্দনারও অবতারণা করা হয়েছে। এগুলো নামমাত্র নাটক ছিল। প্রকৃতপক্ষে আখ্যায়িকা কাব্যের রূপ লাভ করেছিল। নাটক বলতে যে প্রকৃত কী বোঝায় তা তখনও এদেশের বাঙালি সমাজ সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেনি। তাই সে সময় সংলাপ আকারে রচিত যেকোন রচনাই 'নাটক' নামে অভিহিত হয়। বলা বাহুল্য যে প্রাথমিক পর্বে নাটক সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ ছিল।

দ্বিতীয় পর্ব: ১৮৫২ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর্বের নাটকের পর্যালোচনা এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত। বাংলা নাটকের দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত ১৮৫২ সালে রচিত জি.সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' নাটক ও তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটকের মাধ্যমে। জি.সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' ভদ্রার্জুন নাটকের কয়েক মাস পূর্বেই প্রকাশিত কিন্তু ত্রুটিগত কারণে 'কীর্তিবিলাস' অপেক্ষা 'ভদ্রার্জুন' নাটক প্রথম সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। 'ভদ্রার্জুন' নাটকের —

> "ভূমিকায় তারাচরণ শিকদারের একটি উক্তি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার পূর্বে বাংলা ভাষার মৌলিক কোন নাটক না থাকিলেও সংস্কৃত নাটকের কয়েকটি অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছিল; তিনি লিখিয়াছেন 'এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে।"[৪]

তারাচরণ শিকদার কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকে অর্জুনকর্তৃক সুভদ্রা হরণের বৃত্তান্ত অবলম্বনে 'ভদ্রার্জুন' নাটক রচনা করলেও কয়েকটি দিক থেকে তাঁর নাটক মৌলিকতার দাবি রাখে। তিনি কাহিনি মহাভারত থেকে গ্রহণ করেছেন কিন্তু আঙ্গিক গ্রহণের ক্ষেত্রে সংস্কৃত রীতির তুলনায় পাশ্চাত্য প্রথাকে বেশি অনুসরণ করেছেন। নাট্যকার পাশ্চাত্য প্রথা অনুযায়ী তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু ও কাহিনি বিন্যাসকে পাঁচ অঙ্কে ও প্রত্যেক অঙ্ককে কয়েকটি দৃশ্যে বিভক্ত করেছেন। তাঁর পূর্বে এবং পরে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদমূলক নাটক রচনার ধারা অব্যাহত ছিল, কিন্তু তিনি ওই সময়ে এমন বিষয় নিয়ে প্রথম বাংলা নাটক রচনার মধ্যে যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময়কর বটে। তাছাড়া সংলাপ রচনা ক্ষেত্রে তিনি গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তখনও বাংলা নাটকের ভাষা সৃষ্টি হয়নি, সেক্ষেত্রে সমসাময়িক ভাষাকে যথার্থ নাটকীয় রূপ দিয়ে ব্যবহার করতে হয়েছে যা তাঁর অনন্য কৃতিত্বের পরিচায়ক।

১৮৫২ সালে জি. সি. গুপ্ত 'কীর্তিবিলাস' নাটক রচনা করেন। অনেকের মতে এটাই প্রথম মৌলিক নাটক। ইংরেজি সাহিত্যে প্রচলিত বিয়োগান্ত নাটকের সার্থকতা দেখে বাংলা ভাষায়ও তা প্রবর্তনের জন্য তিনি উৎসাহিত হন। ১৮৫২ সালে দেশীয় সাহিত্য সম্পর্কিত সকল প্রকার সংস্কারের বিরোধিতা করে বাংলায় সর্বপ্রথম এখানে পূর্ণাঙ্গ বিয়োগান্ত নাটক রচনার সক্রিয় প্রয়াস 'কীর্তিবিলাস' নাটক। এক্ষেত্রে নাট্যকার একই সঙ্গে সংস্কৃত ও

ইংরেজি নাট্যরীতি গ্রহণ করেছেন তাঁর নাটক রচনায়। নাটকের সংলাপ গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত বাংলা ভাষা। সংলাপের ভাষায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব স্পষ্ট। নাটকের কাহিনি অনেকটাই হ্যামলেট থেকে গৃহীত। তবে নাট্যকার প্লটকে আমাদের রূপকথার আধারে বসিয়েছেন। নাটকটি পঞ্চমাঙ্ক। 'Act' এখানে 'অঙ্ক' নামে অভিহিত হয়েছে। তবে 'Scene' এখানে অভিনয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'কীর্তিবিলাস' এর নাট্যকার আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃতি অনুযায়ী 'নান্দী' ও 'নান্দ্যন্তে সূত্রধার' দ্বারাই তাঁর নাটকের সূত্রপাত করেছেন। সপত্নী পুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচারের কাহিনি নিয়ে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। শীত-বসন্তের রূপকথার নিষ্ঠুরতা বর্ণিত হয়েছে। বিজয়-বসন্তের কাহিনি নিয়ে বহু যাত্রা ও নাটক লিখিত হয়েছে। আলোচ্য নাটকে কুৎসিত সপত্নী বিদ্বেষ এবং তারই নিষ্ঠুর পরিণতি প্রদর্শিত হয়েছে। নাটকের বিয়োগান্ত পরিণতি উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই দেখানো হয়েছে। উপযুক্ত কারণের অভাব হেতু নাটকটি রসোত্তীর্ণ পরিণতি লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

সমকালে আরও কয়েকজন নাট্যকারের হাতে সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের অনুবাদ হয়। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হরচন্দ্র ঘোষ, যিনি বাংলা নাটকের ইতিহাসে প্রথম একাধিক নাটক রচনা গৌরবের অধিকারী। তাঁর প্রথম নাটক শেক্সপীয়ার রচিত 'দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস' এর বাংলা অনুবাদ 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫৩), দ্বিতীয় নাটক 'কৌরব বিয়োগ' (১৮৫৮) মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে রচিত। নাটকটি তাঁর একমাত্র মৌলিক নাটক। তাঁর তৃতীয় নাটক শেক্সপিয়ারের প্রসিদ্ধ নাটক 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' এর বাংলা অনুবাদ 'চারুমুখ চিত্তহরা'। চতুর্থ তথা শেষ নাটক 'রজতগিরি নন্দিনী' ১৮৭৪ সালে রচনা করেন। ধর্মীয় আখ্যায়িকা অবলম্বনে ইংরেজি 'সিলভার হিল'এর বাংলা অনুবাদ। তাঁর নাটকে তিনি ইংরেজি ও সংস্কৃত উভয় রীতির অনুসরণ করেছেন। কখনো কখনো মঙ্গলকাব্যের বিড়ম্বনা আমদানি করেছেন। হরচন্দ্র ঘোষ তাঁর নাটকে যুগোচিত বৈশিষ্ট্যই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এর পরেই বাংলা নাটকের ইতিহাসে সামাজিক নাটকের সূত্রপাত ঘটে

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের মধ্য দিয়ে। সমাজ সমস্যামূলক নাটকের আলোচনার সুবিধার জন্য তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবগত হতে হয়।

উনিশ শতকের কলকাতার অভিজাত বাঙালি বাবু সম্প্রদায়ের আমোদ-প্রমোদ, বিলাস ব্যসনের শখ মেটানোর জন্য শখের নাট্যশালা গড়ে ওঠে। এই শখের নাট্যশালা অভিনয় চাহিদা পূরণের জন্যই অভিনয় উপযোগী নাটকের সন্ধান সূত্রে বাংলা নাটকের আত্মপ্রকাশ ঘটে। বাংলা নাটক ছিল নিষ্প্রাণ পুতুলের মতো। নিষ্প্রাণ পুতুলে প্রাণের সঞ্চার ঘটানোর চেষ্টতেই বাংলা নাটক অনুবর্তনের সোজা রাস্তা ত্যাগ করে সৃষ্টির জটিল পথ ধরে চলতে শুরু করে। ফলে তা সমাজ ভাবনায় আলোড়িত হয়ে ওঠে। সমাজের বিভিন্ন প্রকার জাগ্রত মানস চেতনার গতি ও সংঘাত বাংলা নাটকে রূপায়িত হয়ে ওঠে। নাটকের মধ্যে যে চেতনা মূর্ত হয়ে ওঠে তার স্বরূপ নিবদ্ধ ছিল তৎকালীন বাংলার সমাজ অভ্যন্তরে।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। নব্যবঙ্গ বা ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর প্রতিভূ ডিরোজিও কর্তৃক হিন্দু কলেজ থেকে প্রাচীন সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী স্বাধীন চিন্তার ধারা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মেকলে ও বেন্টিঙ্কের চেষ্টায় এদেশে ইংরেজি শিক্ষার মূল প্রোথিত হয় এবং ভারত পথিক রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ার কর্তৃক তার মূলে জল সিঞ্চিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রচণ্ড আঘাতে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারাচ্ছন্ন সভ্যতার পুরনো নির্মোক খসে পড়ে। সতীদাহ প্রথা রদ ও বিধবা বিবাহ আইন পাশ এবং বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সমাজে জাগ্রত জনমত গড়ে ওঠে। ১৮২৫ সাল থেকে বাংলার নবজাগরণের সূচনা হয়। ইতিমধ্যে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড' রূপে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এই বিদ্রোহের বহিরঙ্গ নির্বাপিত হলেও সমাজের অন্তরতম প্রদেশে প্রজ্জ্বলিত ছিল। সেই আগুনের জ্বালায় পরাধীন সমাজ গর্জে উঠতে শুরু করে। সে সময়ে বাংলার এক প্রান্তে গণ-

অভ্যুত্থান দেখা দেয়। দরিদ্র উপায়হীন কৃষকগণ এতকাল নীলকর ও জমিদারদের দ্বারা যেভাবে অত্যাচারিত হয়েছিল তারই প্রত্যুত্তর দেখা দেয় এই গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে।

বাংলার সমাজধর্ম ও রাজনীতির এই ভাবাপ্লুত অবস্থায় দ্বিতীয় পর্বের নাট্যকারদের আবির্ভাব। সমাজের এই নবজাগ্রত ভাব তরঙ্গ অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে তাঁদের নাটকের মধ্যে প্রতিফলিত। বিধবা বিবাহ আন্দোলন ছিল তৎকালীন সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী। দ্বিতীয় পর্বের নাট্যকারদের অনেকেই বিধবা বিবাহের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। এ বিষয়ে পথিকৃৎ ছিলেন উমেশচন্দ্র মিত্র ও তাঁর 'বিধবাবিবাহ নাটক'। এই নাটক সামাজিক সমস্যার এক করুণ রসের আকর। তাছাড়া যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'চপলার চিত্তচাপল্য', শিমূয়েল পীরবক্সের 'বিধবাবিবাহ নাটক', মনোমোহন বসুর 'আনন্দময় নাটক, বিধবা বিবাহ বিষয়ক রচনা। বহুবিবাহ ও সমস্যা নিয়ে বহু নাটক রচিত হয়েছিল। সেগুলোর অধিকাংশই ছিল করুণ রসের আবেদন, অপরগুলিতে কৌতুকরসের আঘাত। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাটক 'কীর্তিবিলাস' এই সমস্যা নিয়ে লিখিত। এছাড়া 'নবনাটক', 'উভয় সংকট' (রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত), মনোমোহন বসুর 'প্রণয়পরীক্ষা', দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক' এ বিষয়ে অধিক জনপ্রিয় রচনা। তৎকালীন শিক্ষিত জনগণ একদিকে যেমন বিধবা বিবাহের প্রতি সদর্থক মনোভাব পোষণ করতেন, তেমনি অন্যদিকে বাল্যবিবাহের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্নও ছিলেন। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রবলতম প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল 'সম্বন্ধ সমাধি' নাটকে শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের 'বাল্যবিবাহ' নাটক, রামচন্দ্র দত্তের 'বাল্যবিবাহ' এবং শ্যামাচরণ শ্রীমানীর 'বাল্যোদ্বাহ' নাটক এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা। এছাড়া কৌলীন্য প্রথার দোষ উল্লেখিত হয়েছে বিভিন্ন প্রহসনে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে সমাজ সমস্যামূলক বহু নাটক রচিত হয়। বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ, সামাজিক দোষ ত্রুটি, লাম্পট্য চরিত্র প্রভৃতি বিষয় প্রধানত তৎকালীন

নাট্যকারদের আকৃষ্ট করেছিল। উনিশ শতকের পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং নবজাগ্রত সংস্কার প্রেরণার দ্বারা তাঁরা যে চালিত হয়েছিল সে পরিচয় তাঁদের নাটকের মধ্যে সুস্পষ্ট রূপে চিহ্নিত। বস্তুত নাট্যশিল্প অপেক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যই তাঁদের অধিকতর প্রবল ছিল তার প্রমাণ সহজেই মেলে তাঁদের অনেক রচনায়। কারণ প্রায় সব নাটকেই নাটকীয় সংঘাত ও চরিত্র সৃষ্টি অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ সামাজিক তত্ত্ব ও মতবাদ অত্যাধিক আতিশয্য লাভ করেছিল। এই সব নাটকের প্রচার ও প্রভাব বেশি ছিল না, অধিকাংশ আজ প্রায় বিস্মৃত। কিন্তু এগুলো সাহিত্য ক্ষেত্রে সমাজ প্রগতির অবিসংবাদিত সাক্ষী। এই সব নাটকের বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নবীনত্ব থাকলে এঁদের শিল্পরীতি ও রচনাভঙ্গি প্রাচীনত্বের গণ্ডী অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রদীপ্ত আলোকে সমাজের অভ্যন্তরে বহুকাল পোষিত কুৎসিত ব্যাধির অগ্নিরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সমাজ থেকে এই সকল ব্যধি দূর করার জন্য সেকালে বহু সমাজ সংস্কারকের উদ্যমশীল কর্মপ্রচেষ্টার ইতিহাস অজানা নয়। যে নবীন ও প্রাচীন ভাবের সংঘর্ষ তৎকালীন সমাজ জীবনকে আলোড়িত করেছিল সাহিত্যে তার প্রভাব পড়ে অনিবার্যভাবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাবপুষ্ট নবীন ভাবেরই জয় হয়েছিল সেদিন। সেজন্য সাহিত্যেও নতুনত্ব বিলাসী সংস্কারপন্থী মতবাদ উৎসাহের সঙ্গে সমর্থিত হয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের পূর্বে যে সকল নাট্যকার নাটক রচনা করে যশস্বী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম রামনারায়ণ তর্করত্ন। রাম নারায়ণের নাটক সংস্কৃত রীতির পরিপন্থী হলেও বাস্তব এবং স্বচ্ছন্দ সরসতার জন্য তিনি বিশেষ জনপ্রিয় হিসেবে ‘নাটুকে রামনারায়ণ’ আখ্যা পেয়েছিলেন। সমাজের সমস্যা নিয়ে তিনিই সর্বপ্রথম নাটক লিখতে আরম্ভ করেন এবং নিজেও একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও তাঁর মনের উদারতা সকলের

বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বেলগাছিয়া রঙ্গশালার কারণেই তিনি নাটক রচনার প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি এমন এক সময়ে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটি রচনা করেন, যখন কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহ নিয়ে প্রবল জন আন্দোলন চলেছিল। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই জনমত প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে বাংলা নাটকের ইতিহাস গ্রন্থে রয়েছে –

> "১৮১৮ সালের রামমোহন রায় তাঁর 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকে'র দ্বিতীয় সংবাদে লিখিয়াছিলেন, অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাঁহার দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন তাহাদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারিবার সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামী দ্বারা কোন উপকার বিনা ও পিতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতা পূর্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্মনির্বাহ করেন।"[৫]

১৮৫৫ সালে বহুবিবাহ আইনের দ্বারা বন্ধ করার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় আবেদন জানান। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কারণে এই সংস্কার আন্দোলন কিছু কাল স্থগিত থাকলেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অদম্য আন্তরিক সদিচ্ছার কারণে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হলেও বহুবিবাহ আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এরকম সামাজিক সমস্যার কুফল নিয়ে রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁর প্রহসন ও নাটক রচনা করেন। তিনি দুটি সামাজিক নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্ব'(১৮৫৪) ও 'নবনাটক'(১৮৬৬) রচনা করেন। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে কৌলীন্য প্রথার দোষ ও অসঙ্গতি হাস্য রসাত্মক দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়ে সমাজকে নিন্দা করেছেন তিনি। এক কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক চার কন্যার যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিবাহ দিতে সক্ষম হননি। অবশেষে এক বৃদ্ধের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন এটাই এই নাটকের বর্ণিত বিষয়ে। নাটকখানি সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী ছয়টি অংশে বিভক্ত।

নাটকের মধ্যে গুরু গম্ভীর শব্দের পাশাপাশি সরস ও লঘু ভাষার চাপল্য স্থান পেয়েছে। ভাষা ও ভাবের মধ্যে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। নাটকের মধ্যে বিচিত্র বর্ণিত চরিত্রগুলির নাম বিশেষ কৌতূকপূর্ণ। কুলীনের কুলই যে সর্বস্ব তাই নাটকের মধ্যে দেখানো হয়েছে। নাটকের সংলাপ কিছুটা গদ্য ও কিছুটা পদ্যে রচিত। পদ্যে তখনকার প্রচলিত পয়ার, ত্রিপদীর ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। এখানে সংস্কৃত নাটকের প্রভাবও লক্ষণীয়। 'নবনাটক' প্রথম নাটকের ন্যায় উদ্দেশ্যমূলক। দুটি নাটকের জন্যই রামনারায়ণ আর্থিক পুরস্কার লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয় নাটকে তিনি সৌখীন রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষকদের আদেশ অনুসারে লিখেছিলেন। নাট্যকারের নাট্যস্বাধীনতা বড় একটা ছিল না। নাটকের মধ্যে তৎকালীন সামাজিক জীবনের নানা বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। নাটকের মধ্যে বৈধব্য বেদনা, স্তাবকতা দোষ, ভাষা সমস্যা ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচিত হয়েছে। বহু বিবাহের কুফল দেখানোর জন্য বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটিয়েছেন, যা সংস্কৃত নাট্যাদর্শ অনুসরণকারী নাট্যকারের পক্ষে অভিনব সৎসাহসের পরিচায়ক। তর্করত্ন মহাশয় তিনটি পৌরাণিক নাটক রচনা করেছিলেন। 'রুক্মিণী হরণ' (১৮৭১), 'কংসবধ' (১৮৭৫) ও 'ধর্মবিজয়' (১৮৭৫)। তিনি চারটি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেন- ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' (১৮৫৬), শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' (১৮৫৮), কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' (১৮৬০), ভবভূতি 'মালতী মাধব'। এছাড়া তিনি তিনটি প্রহসন রচনা করেছেন- 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' (দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৭৯), 'চক্ষুদান' (১৮৬৯), 'উভয় সংকট' (১৮৬৯)। রামনারায়ণ তর্করত্ন সামাজিক, পৌরাণিক বিভিন্ন প্রকার নাটক রচনা করলেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায় হাস্যরসের ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রহসন রচনায়। সামাজিক সমস্যার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং সমস্যার বাস্তব রূপ তুলে ধরতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

সৌখিন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার সৌজন্যে বাংলা নাটকের পথ চলা শুরু। আর এই সৌখিন নাট্যশালার প্রয়োজন মেটানোর তাগিদেই রামনারায়ণ তর্করত্নের নাট্যপ্রতিভা বিকাশ ও

ব্যাপ্তি লাভ করেছে। তাঁর রচিত নাটক ও প্রহসন গুলির বিভিন্ন নাট্যশালা সাফল্যের সঙ্গে বহুবার অভিনীত হয়। তাঁরই সমকালে আরো কয়েকজন সাহিত্য অনুরাগী বাংলা নাটকের পথকে সচল রাখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন- তাঁদের মধ্যে অন্যতম পথিকৃৎ হলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন নিজের উদ্যোগে। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয় হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বেণীসংহার' নাটকের বাংলা অনুবাদ। এছাড়া কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজে কালিদাসের 'বিক্রমোবর্ষী' নাটকের অনুবাদ ও অভিনয় করেন। তাঁর মৌলিক নাটক 'সাবিত্রী সত্যবান'ও এই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। 'মালতী মাধব' নাটকের বাংলা অনুবাদ এই রঙ্গমঞ্চে পঠিত হয়েছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়াতেই বাংলা নাটককে আধুনিক করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। রামনারায়ণ তর্করত্ন তৎকালীন সমাজের বৃহত্তর সমস্যাকে কেন্দ্র করে নাটক রচনা করলেও সে নাটক যে আধুনিক অর্থে যথার্থ নাটক ছিল না, সে কথা মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'র (১৮৫৯) প্রস্তাবনায় লিখিত খেদোক্তিতেই প্রকাশিত—

'অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়বঙ্গের
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।'

–মধুসূদনের এই খেদোক্তিই মধুসূদনপূর্ব বাংলা নাটকের অপূর্ণতা সম্পর্কে এক বড় সাক্ষ্য দেয়। প্রকৃতপক্ষে তার পূর্বে বঙ্গ রঙ্গশালা প্রতিষ্ঠিত হলেও এই সংগঠনের উপযোগী নাটক রচিত হয়নি। ইংরেজি প্রভাবের ফলে আমাদের দেশে রঙ্গশালা সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু তখনও ইংরেজি নাটকের সমধর্মী আধুনিক নাটকের সূত্রপাত হয়নি। বাংলা নাটকে প্রথম সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের বন্দীশালা থেকে নাট্যভারতীকে উদ্ধার করে আধুনিক সাজ সজ্জা ও

অলঙ্কারে ভূষিত করেছিলেন। পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যের রীতি অনুসারে তাঁর নাটক পাঁচ অঙ্ক ও প্রত্যেক অঙ্কে কয়েকটি দৃশ্য বা গর্ভাঙ্কে বিভক্ত।

রামনারায়ণ তর্করত্নের হাতে বাংলা নাটক প্রথম শৈশবের হামাগুড়ি দেওয়া থেকে উঠে দাঁড়াতে শিখেছিল। আর মধুসূদনের হাতে বাংলা নাটক নিজ পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "মধুসূদন দত্ত (১৮২৪- ১৮৭৩) নিজ প্রতিভার স্পর্শে বাংলা নাটককে অনিশ্চিত পরীক্ষার অস্থির ও উদ্দেশ্যহীন গতি হইতে মুক্তি দিয়া উহার নিজস্ব প্রকৃতিটি আবিষ্কার করিলেন; ইহার নানামুখী উদ্‌ভ্রান্ত প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রসংহত করিয়া ভবিষ্যৎ গতিপথটি স্থির করিয়াছিলেন।"[৬]

সৌখিন রঙ্গমঞ্চে প্রতিষ্ঠাকালে বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে এর গুরুত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রতিভার প্রকাশ ও বিকাশ এই রঙ্গশালার কারণেই। আরে এই কারণে মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে। রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ কাজের কারণেই তিনি অনুভব করেন বাংলা নাটকের অভাবের কথা। এবং তার ফল স্বরূপ আমরা তাঁর কাছ থেকে পাই বহু মূল্যবান কয়েকটি নাটক ও প্রহসন। তাঁর 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী', 'মায়াকানন' নাটক এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা' এই দুটি প্রহসন বাংলা নাট্যকলার প্রথম সার্থক ও সুসংবদ্ধ প্রকাশরূপে চিরস্মরণীয়। নাটক রচনার ক্ষেত্রে মধুসূদন মহাভারত ও ইতিহাসের কাহিনিকে গ্রহণ করেছেন আর প্রহসনের ক্ষেত্রে তৎকালীন বাস্তব সমাজের সমস্যাকে সুচারুরূপে তুলে ধরেছেন। মধুসূদন দত্তের রচনায় সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকণের চিহ্ন থাকলেও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলে ঘনীভূত নাট্যরসে নাটকীয় রসপুষ্টির ঘটনাবিন্যাসে এবং চরিত্র সৃষ্টি ও মূল্যায়নে আধুনিক যুগের বাঙালির প্রাণধর্ম ও জীবন নিষ্ঠতার পরিচয় সুস্পষ্ট।

'শর্মিষ্ঠা' নাটকের আখ্যান অংশ মধুসূদন মহাভারতের আদি পর্ব থেকে সংগ্রহ করেছেন। মহাভারতের গল্পে যে আদিমতা ছিল উনিশ শতকের নাট্যকার তা সংশোধন করে নিয়েছেন। বাংলা নাট্যমঞ্চে তিনি বাংলা নাটককেই চেয়েছেন, সংস্কৃত নাটকের রোমন্থন নয়। শুধু বাংলা নাটক নয় তাঁর লক্ষ্য ছিল আধুনিক বাংলা নাটক। এ প্রসঙ্গে ড. অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন—

> "পুরাণ হইতে কাহিনী গ্রহণ করিয়া মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম মৌলিক পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। তাহার পরে অনেকেই পৌরাণিক নাটক লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের নাটক অপ্রাকৃত ও অলৌকিক বিষয় সমন্বিত হইয়া অনেক স্থলেই যাত্রা লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মাইকেল তাহার সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করেন নাই এবং ঘটনা সংস্থাপন ও চরিত্র সৃষ্টির দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছেন।"[৭]

শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর যুগ্ম আকর্ষণে যযাতির চিত্তের দোলায়মানতা, দেবযানীর প্রতিদ্বন্দ্বিনী রূপে নির্ধারিত শর্মিষ্ঠার সংকোচ প্রকাশ ও গোপন প্রেমের মধ্যে যে মনোভাবের তারতম্য– এগুলিই ছিল নাট্যরসের মুখ্য উপাদান। কিন্তু মধুসূদন এইসব সূক্ষ্ম মানস প্রতিক্রিয়ার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে দেবযানীর অতি উচ্ছ্বসিত অভিমান, শুক্রাচার্যের অভিশাপ প্রভৃতি ঘটনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মধুসূদন মহাভারতের মূল কাহিনির অনুবর্তন করেছেন। পৌরাণিক আখ্যানরস নাট্যরস অপেক্ষা তাঁর কাছে প্রাধান্য লাভ করেছে। তবুও 'শর্মিষ্ঠা'র মৌলিকতা সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র মৈত্র লিখেছেন —

> "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সৃজনশীল অধ্যায় তখনও সূচীত হয়নি। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী উপাখ্যান তখনও মুদ্রাযন্ত্রের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আখ্যায়িকা সমৃদ্ধ রচনা কোনোটাই

মৌলিক সৃষ্টি নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী আরও আট বছর পরে আত্মপ্রকাশ করবে। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলাল' ও কালী প্রসন্নের 'হুতোম' পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ হলেও এই দুটি গ্রন্থকে 'সিরিয়াস' সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। মাইকেলের শর্মিষ্ঠা প্রথম মৌলিক 'সিরিয়াস' রচনা আধুনিক দৃষ্টিতে।"[৮]

দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী'(১৮৬০) গ্রীক পুরাণের আখ্যানবস্তু নিয়ে রচিত। মধুসূদন দত্ত অবশ্য গ্রীক পুরাণকে হিন্দু পুরাণের ছাঁচে ঢেলে তাকে বাঙালি ধর্মসংস্কার অনুযায়ী রূপ দিয়েছেন। নাটকের ঘটনা বিন্যাস ও শেষ পরিণতি ভারতীয় অলৌকিক দৈব সংগঠনের উপর প্রতিষ্ঠিত দৃশ্য সংস্থানের দিক দিয়ে 'পদ্মাবতী' 'শর্মিষ্ঠা'র তুলনায় অধিকতর অবিন্যস্ত।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে যুগান্তকারী রচনা 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) নাটক। প্রথমত এই নাটকটির কাহিনি ইতিহাসের থেকে নেওয়া। এটি প্রথম ঐতিহাসিক বাংলা নাটক। দ্বিতীয়ত এটা বাংলা সাহিত্যের সংস্কৃত নাট্যরীতির আদর্শ মুক্ত সর্বপ্রথম ট্রাজিক নাটক। যদিও এর পূর্বে 'কীর্তিবিলাস'(১৮৫২), 'বিধবাবিবাহ'(১৮৫৬) নাটক দুটি বিয়োগান্তক নাটক হলেও জনসাধারণের মধ্যে এদের প্রচার ছিল না। চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম গতানুগতিকতা মুক্ত মৌলিকতার আভাস পাওয়া যায়। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের কাহিনি মধুসূদন দত্ত টডের 'রাজস্থান' থেকে সংগ্রহ করেছেন। এখানে মাইকেল মধুসূদন মায়াময় সুখ দুঃখে ভরা পৌরাণিক জগৎ থেকে ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ অমোঘ কার্যকারণ-শৃঙ্খলায় গ্রথিত, দ্বন্দ্বময় রঙ্গভূমিতে নেমে এসেছেন। অন্যান্য নাটকে যে বিপদের ঘটনা দৈবানুগ্রহে মুহূর্তে কেটে গিয়েছে এখানে তা ঘনীভূত হয়ে বজ্রনির্ঘোষে মানব ভাগ্যকে অভিভূত করেছে। রাজপুত ইতিহাসের রাজন্যবর্গের আত্মকলহ গার্হস্থ্য জীবনের ছোটখাট চক্রান্ত মিশে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তাই এই নাটকের শোকাবহ পরিণতি ঘটিয়েছে।

শর্মিষ্ঠা রচনা পর তিনি দু'খানি প্রহসন রচনা করেন। প্রহসন দুটিতে স্বল্পতম পরিসরের মধ্যে তার ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা ও অভ্রান্ত লক্ষ্য তাঁর নিখুঁত সঙ্গতিবোধ ও নাটকীয় উদ্দেশ্যের একমুখীনতাকে উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট করেছে। সমাজজীবনের অসংখ্য দুর্নীতি অসঙ্গতির মধ্যে আপন শক্তিকে বিক্ষিপ্ত ও ব্যঙ্গের অতিরঞ্জনে স্বাভাবিকতাকে বিকৃত না করে তিনি সুনির্বাচিত একটি বিষয় থেকে পূর্ণ কৌতুররসের বিকাশ সাধন করেছেন। নবীনের আলোড়ন উশৃঙ্খলতা ও প্রাচীনের ধর্মাভিনয়ের অন্তরালে পাপাসক্তি উভয়কেই সমান ভাবে ব্যঙ্গ করে তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন নাটকের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত, তখন আরও দুজন শক্তিমান নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটে। এই দুই নাট্যকার দুই বিপরীত প্রবণতা নিয়ে বাংলা নাট্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। একজন বাংলা নাটককে আরও বাস্তবের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। দ্বিতীয়জন পুরাণের আশ্রয়ে নবীন যুগের দাবি আংশিক পূরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রথম ব্যক্তি যাত্রা শুরু করলেন নিয়মবহির্ভূত নাট্যশৈলীর অবতারণা করে, পরে ফিরে এলেন গৃহীত নিয়মের অঙ্কে। দ্বিতীয় ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়ম অনুগত নাটক লিখেছেন। সূচনায় সে নিয়ম ছিল পুরাতনের বা প্রাচ্য সংস্কারের অনুবর্তন, পরে ধীরে ধীরে নবীন রীতি প্রশমিত হল। প্রথম ব্যক্তি দীনবন্ধু মিত্র (১৮১৯-১৮৭৩)। তিনি কি ভারতীয় কি ইউরোপীয় কোনো নাট্যশাস্ত্রকে আদর্শ ভেবে মঞ্চে পদার্পণ করেননি। বাস্তবের রূপায়ণে স্বতঃই যা উদ্ভূত হয় তাই হল তাঁর নাটক। তাঁর নাটকের চরিত্র তোরাপের মতই তা মাটির একান্ত সন্তান। সম্ভবত এই নাট্যরীতি সে যুগে ছিল অসমসাহসী। রাজনৈতিক অর্থে নয় নাট্যিক জিজ্ঞাসার দিক থেকে। শুধু স্বদেশীয় সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও। অ্যারিস্টটল ও ভরতমুনি দুই নাট্যশাস্ত্রীর দিক-নির্দেশকে অতিক্রম করেও তিনি পথভ্রষ্ট হননি। মনোমোহন বসু প্রথমে ভরতমুনির নির্দেশ মাথা পেতে গ্রহণ করলেন, সেই আবার ইউরোপে আদর্শেও বিচলিত হলেন। বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশের

ইতিহাস পরস্পর বিরোধী এই দুই পরীক্ষামূলক প্রয়াস আজ নাট্য সমালোচকদের কৌতূহলের বিষয়।

দুই নাট্যকারের পথ পরিক্রমায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন নিয়ম যে অনিবার্য নয়, অবিনশ্বর নয় তা তিনিই প্রথম দেখালেন। নিয়ম সত্য ও সুন্দরকে প্রকাশিত করে মাত্র। মধু কবির ন্যায় দীনবন্ধু মিত্র এবং মনোমোহন বসু এ সত্যকে মেনে নিয়েছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র মধুসূদনের প্রায় সমসাময়িক নাট্যকার। এই দুই শ্রেষ্ঠ অথচ ভিন্ন দুই ভাবাদর্শে বিশ্বাসী নাট্যকারের যুগপৎ আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যে নাট্যচেতনা যে কতখানি প্রসার লাভ করেছে তার নিদর্শন তাঁদের নাট্যসৃষ্টি। দীনবন্ধু মিত্র ও মধুসূদন দত্তের প্রকৃতি ও জীবনচর্চা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের। একজন জীবনকে দেখেছেন কৈশোর ও প্রথম যৌবনে এক অদম্য উচ্ছ্বাসে ঘূর্ণিবায়ুর ভিতর দিয়ে এবং পরবর্তীকালে এক মহাকাব্যোচিত মহিমা ও পৌরাণিক ভাবানুষঙ্গের অন্তরাল থেকে। অন্যজন জীবনকে দেখেছেন অলিতে গলিতে, পল্লী ও মফস্বল শহরের সহজ বিকীর্ণতায় ও ব্যাপ্তিতে, ইতর জনতার ভাঙাচোরা মুখের কথায় ও মনোভঙ্গিতে; হাস্যরসের সমস্ত আবরণ সরানো অন্তর্ভেদী তির্যক দৃষ্টিতে। তাই মধুসূদন দত্তের মিলনান্তক নাটক সংযত ও গম্ভীর প্রকৃতির; অপরপক্ষে বিয়োগান্তক নাটক অভিজাত রুচিতে আতিশয্য বিরোধী। তিনি দীনবন্ধু মিত্রের মতো প্রাণ খুলে হাসতে ও আশা মিটিয়ে কাঁদতে জানতেন না। বাংলার জীবনযাত্রা তাঁকে তার এই নিজস্ব ও মার্জিত ভাব আতিশয্যের শিক্ষা দেয়নি। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে প্রথম বাংলা জীবনের উচ্চতর পরিমণ্ডলের পরিবর্তে মাটির স্পর্শ পাওয়া যায়। তাঁর নাটকে তথাকথিত কোন ধার করা উপায় কৃত্রিম উপাদান নেই। তাঁর নাটকের দেহ ও মন গড়ে তুলতে বাংলা জীবনসম্ভূত রসধারাই প্রধান সহায়ক হয়ে উঠেছে।

দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০)। নাটকটি উদ্দেশ্যমূলক। নীলকর ইংরেজদের অত্যাচার নিপীড়িত শোষিত কৃষক সম্প্রদায়ের দুর্দশার কাহিনি এই নাটকের বিষয়বস্তুতে প্রতিফলিত। তৎকালীন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যাঁরা সমগ্র দেশকে উত্তেজিত করে তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও দীনবন্ধু মিত্র। বাংলা নাটকের ইতিহাসে 'নীলদর্পণ' দীপশলাকা স্বরূপ। বাংলা কৃষক সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দশা কখন কোনো সাহিত্যের বিষয় হতে পারে তা দীনবন্ধু মিত্রের পূর্বে কেউ উপলব্ধি করতে পারেননি। এই দর্পণ নাটক যেমন একদিকে সমগ্র বাঙালি জাতিকে জাগ্রত করে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে সাহস জুগিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন সাহিত্য রচিত হয়েছিল। শুধু তাই নয় ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ের টনক নড়ে উঠেছিল, একই সঙ্গে নিজেদের স্বরূপ দেখে এবং বাংলাতে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে চাপা থাকা ক্ষোভের আগুন দেখে। 'নীলদর্পণ' বাংলা নাটকের যাত্রাপথকে ভিন্নমাত্রার শক্তি যোগাতে সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে এই নাটকের অভিনয় দিয়ে শুরু হয় সাধারণ রঙ্গালয়ের। যা পরে বাংলা নাটকে ভিন্ন পর্বের সূত্রপাত ঘটায়। 'রাজেন্দ্রলাল এর মর্ম উপলব্ধি ঠিকই করেছিলেন, "নীলদর্পণ বঙ্গদেশের ভাবি ইতিহাস লেখকদিগের উপজীব্য হইয়াছে। যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে বঙ্গভাষা পঠিত ও কথিত হইবে ততকাল নীলদর্পণ সম্মানে পরিগৃহীত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।"'[৯]

তাঁর দ্বিতীয় নাটক নবীন তপস্বিনী নাটকটি প্রিয় সুহৃদ বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গীকৃত করেছিলেন। উৎসর্গ পত্রে তিনি লিখেছেন–

> "আমার 'নবীন তপস্বিনী' প্রকৃত তপস্বিনী- বসনভূষণহীন- সুতরাং জনসমাজে যদি 'নবীন তপস্বিনী'র সমাদর হয় তাহা সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের সহৃদয়তার গুণেই হইবে।"[১০]

নাটকের আখ্যানভাগের পরিকল্পনায় মৌলিকতার পরিচয় কম। কাহিনিতে বাস্তব সংসারের সঙ্গে বিশেষ সংযোগ নেই বললেই চলে। রাজারাজড়াদের কাহিনি হলেও তাদের আচরণ রাজন্য সুলভ নয়। রূপকথার গল্পের ছাদে তিনি তাঁর যুগের কথাকে বলতে চেয়েছেন। তাঁর এই নাটক বহু বিবাহের বিরুদ্ধে লিখিত। বিষয়বস্তু তাঁর সমকালের বহু আলোচিত বিষয়। বিদ্যাসাগরের সমকালে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে আধুনিক। ঘটনার জটিলতা ও বৈচিত্র্য নাটকটির গতি বৃদ্ধি করেছে। দুটি কাহিনির মধ্যে নাটকীয় রসকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন নাট্যকার। এক ভাগে রয়েছে রোমান্স কল্পনা- রমণীমোহন, তপস্বিনী, বিজয়, কামিনীর উপাখ্যান প্রেম এবং বিচ্ছেদ মূলকা। অন্যভাগে রয়েছে হাস্যরসের কল্পনা- জলধর, জগদম্বা, মালতী, বিনায়ক, মল্লিকার কাহিনি। দ্বিতীয় ভাগের কাহিনি শেক্সপিয়ারের 'Merry Wives of Windsor' নাটকের প্রভাব রয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ নাটক 'লীলাবতী'(১৮৬৭) ও 'কমলেকামিনী' (১৮৭০) বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

দীনবন্ধু মিত্রের প্রতিভার ব্যাপ্তি 'নীলদর্পণ' নাটক ও তাঁর প্রহসন গুলির জন্য। তিনটি প্রহসন তিনি রচনা করেছেন– 'সধবার একাদশী'(১৮৬৬), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'(১৮৬৬) ও 'জামাই বারিক'(১৮৭২)। প্রহসন তিনটিতে তৎকালীন ভদ্রসমাজের নবীণ ও প্রবীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে চরিত্রগত অধঃপতন, বহুবিবাহ সমস্যা এবং সম্ভ্রান্ত অভিজাত পরিবারের ঘরজামাইদের দুরবস্থা আখ্যানবস্তু হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্র অবিসংবাদিত রূপে বাংলা সাহিত্যে একজন শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক। ইতিপূর্বেই রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁর নাটক রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসনও সেই পথের পথিক। দীনবন্ধু মিত্র এই পথ অনুসরণ করলেও তিনি তাঁর পূর্বসূরিদের থেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। দীনবন্ধু ছিলেন যথার্থ হাস্যরসিক (Humorist)। জীবনের ছোটখাটো অসঙ্গতির উপর তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরস বর্ষণ করে তাকে ধুয়ে মুছে নির্মল করে দিতেন, কিন্তু তার উপর কশাঘাত করতেন না। দীনবন্ধু

মিত্রের বহু দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম কতকগুলো সামাজিক চরিত্র সৃষ্টিতে সার্থকতা লাভ করেছেন। একথা সত্য যে দীনবন্ধু মিত্রের দৃষ্টিতে সাধারণত প্রত্যক্ষ খণ্ডবস্তুকে আশ্রয় করে প্রকাশ পেয়েছে- সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ অংশকে মিলিয়ে এক একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্র সৃষ্টি তার ক্ষমতার অতীত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে সকল সামাজিক চরিত্র সমগ্র ভাবেই তাঁর অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত ছিল তাদের রূপায়ণে, তাদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় যথাযথ ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। তাঁর সৃষ্ট এই প্রকার চরিত্রের সংখ্যা অল্প ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই চরিত্রগুলির দ্বারাই তাঁর প্রতিভার বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। মাইকেলের মধ্যে একই প্রকাশ, একই প্রকার চরিত্র বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তা সত্বেও তাঁর পরিকল্পিত বাংলার সামাজিক চরিত্রগুলি অসম্পূর্ণ, কেবলমাত্র প্রহসনে তা রূপায়িত। কিন্তু বাঙালির জীবনেও যে নাট্যসাহিত্যের চরম মূল্যবান উপাদান বর্তমান ছিল, তা দীনবন্ধুর পূর্বে এমন পূর্ণাঙ্গ রূপ চোখে আঙুল দিয়ে কেউ দেখিয়ে দিতে পারেননি। তাঁর নিমচাঁদ, অভয়কুমার, কামিনী এরা আমাদের ঘরের লোক হয়েও যেভাবে নাট্যমঞ্চের উপর দিয়ে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করে তার দ্বারা সেদিন বুঝতে পারা গিয়েছিল যে বাঙালির জীবনেও মূল্যবান নাটকের উপাদান বিক্ষিপ্ত ভাবে রয়েছে।

দীনবন্ধু মিত্র তাঁর প্রত্যেক চরিত্রকে সহানুভূতির দ্বারা প্রত্যক্ষ করতেন বলে চরিত্রগুলি যেমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে তেমনি জীবনের কতগুলো গূঢ় সত্যও এদের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর হাস্যরসের অধিকাংশ চরিত্রেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে করুণ রসের আধার। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তিকে আশুতোষ ভট্টাচার্য সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন-

"কমেডি তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে গিয়াই ট্রজেডিতে উপনীত হইতে হয়– সেই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, দীনবন্ধুর অধিকাংশ সামাজিক নাটকই উচ্চাঙ্গের ট্রাজেডি হইতে পারিত, কিন্তু তাহার সাহিত্যধর্ম ট্রাজেডি সৃষ্টির বিরোধী ছিল বলিয়া তাঁহার কমেডি তার ট্রাজেডির মাত্রায় চড়িতে পারে নাই। বৃদ্ধের বিবাহ-সাধের মধ্য দিয়া হাস্যরসের পরিবর্তে মানব জীবনের এক করুণ সত্য প্রকাশ পায়, তাহা তাঁহার 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনের ভিতর দিয়া গোপন থাকিতে পারে নাই; উচ্চশিক্ষিত নব্য যুবক নিমচাঁদের মাতলামীর ভিতর দিয়া যে তাহার ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের করুণ বিলাপই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও নাট্যকার গোপন করিতে পারেন নাই। অভয়কুমারের প্রতি কামিনীর আক্রোশের ভিতর দিয়াও যে অসঙ্গত সমাজ ব্যবস্থার ফলে তাহার ব্যক্তি জীবনের নিষ্ফলতা জনিত আক্রোশ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও তো 'জামাই বারিক' নাটকের মধ্যে গোপন নাই। বাঙালি জীবনের মধ্যে এক বিচিত্র নাটকীয় উপাদান সংগ্রহের সর্বপ্রথম কৃতিত্ব দীনবন্ধুরই প্রাপ্য।"[১১]

দ্বিতীয় পর্বের প্রথম পর্বাঙ্গের শেষ নাট্যকার হলেন মনোমোহন বসু (১৮৬৭-১৮৯০)। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে আদি ও মধ্যযুগের সন্ধিক্ষণে তাঁর আবির্ভাব। তিনি আদি যুগের প্রভার সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেননি একথা সত্য। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে তাকে বাংলা নাটকের মধ্যযুগের অগ্রদূত বলে নির্দেশ করা যেতে পারে। তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা নাটককে অধিক সংখ্যক সঙ্গীত যুক্ত করে এক নতুন রূপ দিয়েছেন। অধিক গানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি তাঁর 'সতী' নাটকের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন—

"ইউরোপে নাটককাব্যে গান অল্পই থাকে, আমাদের তথাবিদ গ্রন্থে গীতাধিক্যের প্রয়োজন। ইহা জাতীয় রুচিভেদে স্বাভাবিক। যে দেশের বেদ অবধি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ধারাপাত পর্যন্ত স্বর-সংযোগ ভিন্ন সাধিত হয় না; যে দেশের লোক সঙ্গীতের সাহচর্য বিরহিত পুরাণ পাঠ ও শ্রবণ করে না; যে দেশের আপামর সাধারণ জনগণ পরাধীনতার জন্য সর্বপ্রকার হীনতা ও দীনতার হস্তে পড়িয়াও পূর্ব গান্ধর্ববিদ্যার অঙ্গের সঙ্গে নানা রঙ্গ অত্র বঙ্গে যাত্রা, কবি, পাঁচালী, ফুল ও হাফ আখড়াই, কীর্তন, তর্জমা, ভজন প্রভৃতি নিত্য নূতন সঙ্গীতামোদে আবহমান ঘোর আমোদী; অধিক কি যে দেশে দিবাভিক্ষু ও রাতভিকারীও গান না শুনাইলে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন পাইতে পারে না, সে দেশের দৃশ্যকাব্য যে সঙ্গীতাত্মক হইবে, ইহা বিচিত্র কি? এত কথা এত করিয়া লিখিবার কারণ আছে।... অতএব চরিত্রগত স্বভাবের সমর্থন পূর্বক বাঙ্গালা নাটকে সৎসঙ্গীতের বাহুল্য যতই থাকিবে, ততই লোকের প্রীতির কারণ হইবে, সন্দেহ নাই। নাটকের অন্যান্য অঙ্গের কল্পনা ও বিচারশক্তি যেমন আবশ্যক, গীতি অংশেও তদপেক্ষা ন্যূন হওয়া উচিত নহে।"[১২]

মাইকেল এবং দীনবন্ধু মিত্রের পর বাংলা নাটক সাধারণত পাশ্চাত্য রীতিতে রচিত হলেও প্রাচ্য রীতি একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। পূর্ববর্তী নাট্যকার মনোমোহন বসু প্রাচ্য আদর্শ অনুসরণ করে নাটক রচনা করেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজি নাট্য রচনার আদর্শে কিভাবে বাংলা নাটক রচনা করেছিলেন নাট্য সাহিত্যের প্রাথমিক পর্বের বিবরণ থেকে জানতে পারি। কিন্তু মনোমোহন বসু অনুভব করেছিলেন তাঁদের রচনা জাতির রসপিপাসা চরিতার্থ করতে ব্যর্থ। তাঁর মতে কেবল অনুকরণ দ্বারা সার্থক সৃষ্টি সম্ভব নয়। তাই তিনি ইংরেজি কিংবা সংস্কৃত কোন রীতিরই অনুকরণ প্রেরণা নিয়ে নাটক রচনায়

প্রবৃত্ত হননি। তিনি দুটি সামাজিক ও কয়েকটি পৌরাণিক বিষয় নিয়ে নাটক রচনা করলেও তার মধ্য দিয়ে কোনো আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশ করেননি। মানবিক রসই তার প্রধান উপজীব্য এবং করুণ রসই প্রধান। পৌরাণিক চরিত্রগুলি পৌরাণিক দেবমাহাত্ম হারিয়ে তাঁর নাটকে বাঙালি সুলভ চরিত্র হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে তাঁর রচনা মধ্যযুগীয় বাংলা মঙ্গলকাব্য গুলির সঙ্গে যোগ স্থাপন করে বাঙালির রস ও রুচির সম্পূর্ণ অনুগামী যার মাধ্যমে ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে বাঙালি পুনরায় নতুন করে জাতীয় লোক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে।

মনোমোহন বসুর রুচিবোধ ছিল উন্নত যা বাংলা নাট্য সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্বের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই উন্নত রুচিবোধই বাংলা নাটকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়ে পরিবেশন করার উপযোগিতা দান করেছিলেন। নাটকীয় ভাষার উন্নতির মূলে মনমোহনের বিশেষ অবদান রয়েছে। পূর্ববর্তী যুগের নাটকীয় ভাষার মধ্যে একটা সমতা কিংবা ঐক্য অনুভব করা যায় না- নাটকীয় ভাষা তখনও নিজের ভাবাদর্শের সন্ধান পায়নি। চরিত্রগুলি অনেক সময় পরস্পর এত স্বতন্ত্র প্রকৃতির ভাষা ব্যবহার করেছে যে তার ফলে সমগ্রভাবে একটি নাটকের মধ্যে বাস্তবরস ও ভাব গড়ে উঠতে পারেনি। প্রত্যেক চরিত্রেরই নিজস্ব কথ্য ভাষার মধ্যে যত বাস্তবরসই থাকুক না কেন, সমগ্রভাবে প্রত্যেক নাটকের একটি অখণ্ড রস গড়ে তোলার দায়িত্ব আছে। পূর্ববর্তী যুগের খুব অল্প সংখ্যক নাটকেই এই দায়িত্ব পালন করা হয়েছে। বাস্তবরসকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে মনমোহন বসুই সর্বপ্রথম ভাষার দিক দিয়ে ঐক্যের সন্ধান করবার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী নাট্যকারদিগের মধ্যে এই প্রচেষ্টা অধিকতর সাফল্য লাভ করলেও প্রথম প্রয়াসের কৃতিত্ব মনমোহন বসুরই প্রাপ্য – একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বেলগাছিয়া নাট্যশালার সাফল্য কলকাতা শহরে একটা প্রবল নাট্যোৎসাহ সৃষ্টি করে। নাট্যাভিনয়ের উৎসাহ সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আবির্ভাব ঘটে নানা নাট্যকারের। এরকমই এক নাট্যশালার জন্যই মনোমোহন বসু নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। বলদেব ধর ও চুনিলাল বসুর উদ্যোগে বহুবাজারে একটি নাট্যশালা গড়ে ওঠে। এই নাট্যশালার দ্বারোদ্ঘাটন হয় মনোমোহন বসু 'সতী'(১৮৬৮) নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। তাঁর রচিত প্রথম নাটক 'রামাভিষেক' (১৮৬৭) মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' পর এটিই প্রথম মৌলিক পুরাণাশ্রিত নাটক। নাটকের আখ্যানভাগ পুরোপুরি পুরাণাশ্রয়ী নয়। এর মধ্যে নাট্যকার তৎকালীন বাংলাদেশের সামাজিক রীতিনীতি ও সমস্যাবলীর আমদানি করেছেন। সমসাময়িক অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। রামের বনবাস গমনই এর মুখ্য বিষয়। দশরথের মৃত্যুতে সমাপ্তি। এর মধ্যে মনোমোহন বসু এক দুঃসাহসিক পরীক্ষায় নিযুক্ত হয়েছেন- সংস্কৃত নাটকের আদর্শে নাটকের প্রস্তাবনায় নটনটীর অবতারণা করেও শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত নাট্য আদর্শের বিরোধী বিয়োগান্তক পরিণতি দান করেছেন। সংলাপে গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। নাটকের ঘটনার কোন জটিলতা নেই।

দ্বিতীয় নাটক 'সতী নাটক'(১৮৬৮)। দক্ষ নিন্দায় সতীর দেহত্যাগের সুপরিচিত পৌরাণিক বৃত্তান্ত এই নাটকের আখ্যানবস্তুতে গড়ে উঠেছে। প্রথমে নাটকটির পরিণতি বিয়োগান্তক করেছিলেন কিন্তু প্রাচীন রুচির বিশেষ অনুরোধে নাটক প্রচারের কিছুদিন পর তিনি হরপার্বতী মিলন' নামক একটি মিলনাত্মক উপসংযোগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। নাটকের প্রস্তাবনায় সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী মঙ্গলাচরণ ও নটনটীর অবতারণা করেছেন। সতী ও প্রসূতি দুটি নারী চরিত্রের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। প্রসূতির সন্তানের মধ্যে নাট্যকার বাঙালি মাতৃ হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করেছেন।

হরিশচন্দ্রের আত্মত্যাগ বিষয়ক সুপরিচিত পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবলম্বনে মনোমোহন বসু ‘হরিশ্চন্দ্র নাটক’ রচনা করেন ১৮৭৫ সালে। নাটকটি করুণ রসাত্মক মিলনান্তক নাটক। মনোমোহন বসু ‘প্রণয় পরীক্ষা’ ও ‘আনন্দময় নাটক’ নামে দুটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক রচনা করেন। ‘প্রণয় পরীক্ষা’ নাটকটি সমাজে বহু বিবাহের কুফল নিয়ে রচিত। এখানেই দ্বিতীয় পর্বের প্রথম পর্বাঙ্গের সমাপ্তি ও দ্বিতীয় পর্বাঙ্গের সূত্রপাত ঘটে ১৮৭২ সালের সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

সৌখিন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ফলে বহু প্রতিভাবান নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটে বাংলা নাটকের জগতে। সৃষ্টি হয় বহু নাটক। কলকাতা জনসাধারণের মধ্যে নাট্যরস গ্রহণের স্পৃহা জেগে ওঠলেও কিন্তু তা চরিতার্থ হয় না। বহুকাল আগে থেকে সাধারণ মানুষ এমন এক নাট্যশালার প্রতিষ্ঠায় আকাঙ্ক্ষিত ছিল যেখানে সকল মানুষ অবাধে অভিনয় উপভোগ করতে সুযোগ পাবে। এরকমই এক চাহিদা থেকে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে। যুব সম্প্রদায় উদ্যোগে সাধারণ রঙ্গালয় দ্বারোদ্ঘাটন হয় দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। ১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকের আরেকটি স্তরের সূচনা হয়। ইতিপূর্বে সৌখিন নাট্যশালার সৌজন্যে নাটক অভিনয় হত ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব রঙ্গমঞ্চে। তাতে কেবল নিমন্ত্রিত লোকেরাই দর্শক শ্রেণিভুক্ত, নাট্যামোদী জনসাধারণের সেখানে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল না। সাধারণ লোকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ও দক্ষ অভিনেতা অভিনেত্রীদের দল গঠনপূর্বক অভিনয়কে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত জরুরী। অবশ্যই এখানে বলে রাখা ভালো ১৮৭২ সালে ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকাও চালু হয়, যার ফলে বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ইতিপূর্বে ঘটে যাওয়া ১৮৫৭ সালের সিপাই, ১৮৬০ এর নীলবিদ্রোহ, এছাড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘটে যাওয়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা বিদ্রোহ সমগ্র ভারতবাসীকে পরাধীনতার গ্লানিতে জর্জরিত করে। গঠিত হয় হিন্দুমেলা (১৮৬৭)। সমগ্র ভারতের শিক্ষিত

উদার ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জাতীয়তা বোধ জাগ্রত হয় এবং জাতীয়তাবোধের কারণে সকলের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার ইচ্ছা প্রবলতর হয়। তাঁরা ঐক্যবোধ গড়ে তোলার ভিন্ন পন্থা আবিষ্কারের প্রয়াস করতে থাকেন। অপরাদিকে ন্যাশনাল থিয়েটার বা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সুবাদে দীনবন্ধু মিত্রের সকল নাটক মঞ্চস্থ হয়। সেই কারণে জনসাধারণের মধ্যে একপ্রকার বিদেশি শাসক-বিরোধী ক্ষোভ্র পরিচয় প্রকট হতে থাকে। 'নীলদর্পণ'-এর অনুসরণে নানা 'দর্পণ' নাটক রচিত হয়। যা শ্রমিক, মজুর, জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই সাধারণ রঙ্গালয় সূত্রে ১৮৭২-১৯২২ এই পঞ্চাশ বছরের বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় অনেক বেশি নাটক রচিত হয়। তাই পণ্ডিতগণ এই সময়কালকে বাংলা নাটকের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করেছেন। এই স্বর্ণযুগে আবির্ভাব ঘট বহু বিখ্যাত অনন্য সব প্রতিভাধর নাট্যকারের। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ নাট্যকারের প্রতিভার ব্যাপ্তি এই সময়কালে।

জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেম চেতনা জাগ্রত করার অভিপ্রায়ে বাংলা নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের(১৮৪৯-১৯২৫)। তাঁর নাট্যকার জীবনের সূত্রপাত হওয়ার আগে ১৮৬৭ ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা নব্যশিক্ষিত বাঙালি যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ প্রসঙ্গে রয়েছে -

> "হিন্দু মেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে শেষে স্থির করিলাম নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরব কাহিনি কীর্তন করলে হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে।"[১৩]

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে তিনি যে ঐতিহাসিক নাটক রচনায় মধ্যে মাধ্যমে জাতীয়ভাব উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছিলেন তা সম্পূর্ণ নতুন এবং অদৃষ্টপূর্ব। এ প্রসঙ্গে ড. অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন —

> "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নাটকের মধ্য দিয়া যে জাতীয় ভাব উদ্দীপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন গিরিশ চন্দ্রের নাটক এ তাহার বিকাশ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক তাহার পূর্ণতম পরিণতি।"[১৪]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যরচনাকে চার শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য। ঐতিহাসিক বিষয়াশ্রিত নাটক, গীতিনাটক, প্রহসন এবং অনুবাদ। তাঁর ঐতিহাসিক বিষয়াশ্রিত নাটকের মধ্যে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর তথাকথিত ঐতিহাসিক নাটকগুলি রোমান্টিক লক্ষণাক্রান্ত। স্বদেশীভাব উদ্বোধনের আশায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের স্বাধীনচেতা এবং গর্বোন্নত রাজা পুরুর বিক্রম কাহিনি নিয়ে প্রথম নাটক 'পুরুবিক্রম' রচনা করেন। নাটকটি প্রথমে 'বিদ্বজ্জন সমাগমে' পঠিত হয়, পরে ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। সেকেন্দার শাহের সঙ্গে পুরুর যে সংগ্রাম সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে 'পুরুবিক্রম' নাটকের আখ্যানভাগ গঠিত। আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমনের কাহিনি অনুসরণ করে দ্বিতীয় নাটক 'সরোজিনী' রচনা করেন তিনি। নাটকের প্রেক্ষাপট তুর্কি বিজয় পরবর্তী ভারতবর্ষের কাহিনি। এতে সর্বপ্রথম হিন্দু মুসলমান প্রসঙ্গ মাথা চাড়া দিয়েছিল। অনেকের মতে 'সরোজিনী, নাটকের উপর ইউরিপিডিসের 'Iphignia at Aulis' নাটকের প্রভাব রয়েছে। নাটকটি ছয় অঙ্কে সম্পূর্ণ। ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে 'সরোজিনী' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বাপেক্ষা সার্থক রচনা। টডের রাজস্থানের কাহিনি অবলম্বন করে মাইকেল মধুসূদন যে বাংলা নাটক রচনার ধারা প্রবর্তন করেছিলেন সেই ধারা অনুসরণ করে 'অশ্রুমতী' নামক পূর্ণাঙ্গ বিয়োগান্তক নাটক রচনা

করেন। চিতোরের রানা প্রতাপ সিংহের শেষ জীবনের কাহিনির উপর ভিত্তি করে লিখিত হলেও সেলিম ও অশ্রুমতীর প্রেমকে কেন্দ্র করে যে মূল কাহিনি গড়ে ওঠেছে তাতেই নাটকের ল ও প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। 'অশ্রুমতী' নাটকের মধ্যে মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের প্রভাব স্পষ্ট। রাজস্থানের ইতিহাসেরব পর মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস অবলম্বনে দেশাত্মবোধক নাটক 'স্বপ্নময়ী' রচনা করেন। বর্ধমান রাজ কৃষ্ণরাম রায়ের বিরুদ্ধে শুভ সিংহের বিদ্রোহের কাহিনি এই নাটকের বিষয়বস্তু।

কয়েকটি গীতিনাট্যে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি রাধাকৃষ্ণের দোললীলাকে পটভূমি করে 'বসন্তলীলা' গীতিনাট্যটি লিখেছেন। এই গীতিনাট্যের সংগীতগুলি রবীন্দ্রনাথের রচনা। 'পূর্ণবসন্ত' নামক ক্ষুদ্র গীতিনাট্যে ইন্দ্রের প্রতি সন্দেহ ও অভিমান নাটকীয় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের গীতিনাট্যের প্রভাব প্রবল। মদনভস্মের বৃতান্ত অবলম্বনে 'ধ্যানভঙ্গ' গীতিনাটিকাটি রচিত। এই গীতিনাটিকার শেষে কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের কতকাংশের পদ্যানুবাদ সুখপাঠ্য হয়েছে।

জাতীয়তাবোধ উদ্রেককারী বীর রসাশ্রিত বিষাদান্ত নাটক রচনায় প্রসিদ্ধিলাভ করলেও লঘু, চপল হাস্যমুখর প্রহসন রচনাতেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিশিষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রহসন রচনার মধ্য দিয়েই তাঁর আগমন ঘটেছে বাংলা নাটকের জগতে। তাঁর প্রথম প্রহসন 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'(১৮৭২) অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় 'কমেডি অফ ম্যানার্স' এর আদর্শে রচিত। বহিরঙ্গে দীনবন্ধুর প্রভাব পরিস্ফুট। কিম্ভূতকিমাকার ঘটনা তৈরি করে সমকালের সামাজিক আচার ব্যবহারের অসঙ্গতি ফুটিয়ে তোলাই এই জাতীয় রচনার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় প্রহসনধর্মী রচনা 'এমন কর্ম আর করব না' (১৮৭৭) পরবর্তীকালে 'অলীকবাবু'(১৯০০) নামে প্রকাশিত হয়। মলিয়র রচিত 'দ্য রোমান্টিক লেডিস' ও শেরিডানের 'দ্য রিভেলস' নাটকদ্বয়ের গল্প চরিত্র ও সংলাপের অনুসরণ আছে। অসাধারণ

কৌতুকরস সৃষ্টির কারণে নাটকটি উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ প্রহসনে পরিণত হতে পেরেছিল। এর প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭৭ সালে। এক বৃদ্ধ কৃপণের জব্দ হওয়ার কাহিনি নিয়ে 'হিতে-বিপরীত' রচিত হয়েছে। 'হঠাৎ নবাব' প্রহসনটির জগৎ বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার মলিয়ের 'The Cit Turned Gentelman' নাটকের বাংলা অনুবাদ। 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ'(১৮৯০) প্রহসনটি মলিয়রের 'ম্যারেজ ফোর্স' নাটকের বাংলা অনুবাদ।

এছাড়া তাঁর অনুবাদমূলক নাটক গুলির মধ্যে 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'(১৮৯৯), 'উত্তর চরিত্র' (১৯০০), 'রত্নাবলী' (১৯০০), 'মালতী মাধব' (১৯০১), 'মৃচ্ছকটিক' (১৯০১) 'মুদ্রারাক্ষস' (১৯০১), 'বিক্রমোবর্শী' (১৯০১), 'বেণীসংহার' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেক্সপিয়ারের 'জুলিয়াস সিজার'-এর অনুবাদ করেন তিনি। বাংলা নাটকের প্রথম পর্বের সঙ্গে তিনি যোগ সাধন করেছেন তাঁর অনুবাদ কর্মের দ্বারা।

হিন্দু জাতীয়তাবোধ ও ইতিহাস আশ্রিত রোমান্স কাহিনি অবলম্বনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমকালে বেশ কয়েকজন নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা নানা কারণে নাটকের ইতিহাসে বহু বিখ্যাত হয়ে আছেন। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' ও 'ভারতে যবন' এই দুখানি নাটিকা অতি ক্ষুদ্রাকার হলেও জাতীয় ভাব আন্দোলনের সূচনায় এদের প্রভাব অনেকখানি ছিল। নাট্যকার নাটিকা দুটিকে 'মাস্ক' বা রূপক জাতীয় বলে উল্লেখ করেছেন। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যাশনাল থিয়েটারের কর্ণধার ছিলেন। তার নাটক ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয় এবং হিন্দু মেলায় প্রদর্শিত হয়। এই সময়কালের অন্যতম নাট্যকার হলেন হরলাল রায়। তাঁর নাটকে রোমান্টিক কাহিনি থাকলেও জাতীয় ভাবউদ্দীপনাই তাতে প্রাধান্য লাভ করেছে। বীরত্ব ও মহাপ্রাণতার আদর্শ হরলাল রায়কে উদ্বোধিত করেছিল। সেজন্য স্বদেশী ভাবনায় অনুপ্রাণিত জনসাধারণের কাছে তাঁর নাটক সহজেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাঁর জাতীয় ভাবাত্মক দুখানি নাটক 'হেমলতা' ও 'বঙ্গের

সুখাসান' সর্বাপেক্ষা খ্যাতি অর্জন করেছিল। এ যুগের প্রবল ভাবাদর্শ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পর হরলাল রায়ের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা বেশি ধরা পড়েছিল। হরলাল রায় পেশাদারী থিয়েটারের 'হেমলতা' নাট্যাংশের কাহিনি কাল্পনিক। যদিও রাজপুতানার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। 'হেমলতা'র আখ্যান অংশ ও নাট্যীয় কৌশল দীনবন্ধু মিত্র থেকে গৃহীত। 'বঙ্গের সুখাবসান' নাটকে বক্তিয়ার খিলজী কর্তৃক রাজপুতানা অধিকারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তাঁর 'শত্রু সংহার' নাটক 'বেণীসংহার' নাটকের অনুসরণে লেখা। শেক্সপিয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটক অবলম্বনে 'রুদ্রপাল' রচনা করেন। 'কনক পদ্ম' (১৮৭৫) তাঁর রচিত অন্যতম নাটক।

রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য' বিষয়ক বক্তৃতায় তৎকালের প্রধান নাট্যকারদের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ করেছেন। লক্ষীনারায়ণ চক্রবর্তী সে যুগের পেশাদারী মঞ্চের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। তাঁর চারখানি নাটকই গ্রেট ন্যাশনাল অভিনীত হয়েছিল। তাঁর প্রথম নাটক 'নন্দ বংশোচ্ছেদ' শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচিত। তাঁর অপর ইতিহাসভিত্তিক রচনা 'সিরাজউদ্দৌলা' নামক পাঁচ অঙ্কের এই নাটকে ইতিহাসের সামান্য যোগ পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয় নাটক 'কুলীন কন্যা' অথবা 'কমলিনী' (১৮৭০) কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে রচিত এই নাটক সে যুগে বহু প্রশংসিত হয়েছিল। শেষ নাটক 'আনন্দ কানন' (১৮৭৪)।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রোমান্টিক ভাবকল্পনাকে মূলধন করে নাটক রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন প্রমথনাথ মিত্র। তিনি ছিলেন বীণা রঙ্গমঞ্চের কর্ণধার রাজকৃষ্ণ রায়ের বন্ধু। তাঁর প্রথম নাটক 'নগ-নলিনী', 'প্রেম ও পরিণয়' বিষয়ক রচনা। দ্বিতীয় নাটক 'জয়পাল' (১৮৭৬)। 'জয়পাল' যবনদের হাতে পরাজয়ের কাহিনি নিয়ে রচিত।

প্রমথনাথ মিত্রের মতো আরও এক নাট্যকার হলেন উমেশচন্দ্র গুপ্ত। তিনি রোমান্টিক নাটক লিখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর নাটকগুলি ইতিহাস

অবলম্বনে সে যুগের হিন্দুমেলার ভাবাদর্শ ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিল। 'হেমনলিনী' (১৮৭৪) নাটক 'রোমিও জুলিয়েট'-এর আখ্যায়িকা অনুসরণে কাল্পনিক ইতিবৃত্ত মূলক রোমান্টিক কাহিনি। এতে প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক সব রকম ভাব ও পরিবেশ বর্তমান। বীর, রৌদ্র, আদি, হাস্য ও করুণ কোনো প্রকার রসের অভাব নেই, তবু কোনো নাটকীয় গুণ এই নাটকে মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় নাটক 'বীরবালা'(১৮৭৫) তথাকথিত ঐতিহাসিক নাটক 'পুরুবিক্রম'-এর মতো। এর আখ্যায়িকা গ্রীক-ভারত সংঘর্ষ। সেলুকাসের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের সংঘর্ষকে অবলম্বন করে লেখা। এই নাটকে বীরবালা ও চন্দ্রগুপ্তের কাহিনি বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে। সুকুমার সেনের মতে উমেশচন্দ্র গুপ্তের 'বীরবালা' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের পরিকল্পনা যুগিয়েছিল। তৃতীয় নাটক 'মহারাষ্ট্র কলঙ্ক'(১৮৭৫)। তৎকালীন রোমান্টিক নাটকগুলির ন্যায় এই নাটকীয় প্রেমের সর্বময় প্রভাবে একটু অসঙ্গত।

জাতীয় ভাবোন্মাদনা ও দেশপ্রেমমূলক নাটক রচনা পর্বে নানা কারণে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন উপেন্দ্রনাথ দাস। তাঁর নাটকেই প্রথম প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীকে আক্রমণ করার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। রোমাঞ্চকর ও অতিনাটকীয় উপাদান দ্বারা জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়েছিলেন তিনি। তখনকার উগ্র জাতীয়তাবাদ তাঁর হাতে ইতিহাসের সুরম্য প্রাসাদ পরিত্যাগ করে বাস্তব বাংলা কঠিন মাটিতে পদচারণা শুরু করেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত নর-নারীর সমাজ নিয়ে তিনি নাটক রচনা আরম্ভ করেছিলেন, সেজন্য স্বতন্ত্র, সংস্কারমুক্ত মনোভাব তাদের মধ্যে দেখা গেলেও মাঝে মাঝে তাদেরকে একটু আড়ষ্ট ও অসামাজিক মনে হয়। শিক্ষিত যুবক যুবতীদের মধ্যে তৎকালে যে ইংরেজ বিদ্বেষ ও স্বদেশ হিতৈষী, স্বদেশগর্বী ভাব জাগ্রত হয়েছিল তারই অবতারণা করেছিলেন নাট্যকার তাঁর নাটকে। উপেন্দ্রনাথ দাস ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রথম নাটক 'শরৎ সরোজিনী'(১৮৭৪) দুর্গাদাস ছদ্মনামে প্রকাশ করেন। নাটকটি ১৮৭৪ সালে

ন্যাশনাল থিয়েটারেই অভিনীত হয়। শরৎ-সরোজিনী এবং বিনয়-সুকুমারীর অনুরাগ ও নানা বাধা-বিপত্তির অবসানে তাদের মিলন এই নাটকের আখ্যানবস্তু। নাটকটি ছয় অঙ্কে আটটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ। এ নাটকে নায়ক চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্বদেশ প্রেমের ভাব প্রস্ফুটিত করার প্রয়াস রয়েছে। সে যুগের মঞ্চসাফল্য নাটক গুলির মধ্যে এটি অন্যতম। দ্বিতীয় নাটক 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'(১৮৭৫)। 'নীলদর্পণ' নাটকের পর বাংলা নাট্যসাহিত্যে এবং রঙ্গমঞ্চে নানা কারণে 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকটি সর্বাধিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ১৮৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে নাটকটি অভিনয় হয়। ১৮৭৫ সালের ১৪ আগস্ট বেঙ্গল মঞ্চে 'দি নিউ এরিয়ান' দল প্রথম এই নাটক মঞ্চে অভিনয় করে। ১৮৭৬ সালে 'সুরে বিনোদিনী' নাটককে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সরকার নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন পাস করে। ফলে পরোক্ষ ভাবে ও রূপকচ্ছলে দেশাত্মবোধের ভাব অবলম্বন করে যে নাটক রচনার সূত্রপাত হয়েছিল তা ব্যাহত হয়। তখন ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক এবং নানা সামাজিক ত্রুটি বিচ্যুতিমূলক পারিবারিক জীবনভিত্তিক নাটক রচনার ধারা প্রবর্তিত হয়। সুতরাং উপেন্দ্রনাথ দাসের বাংলা নাটক রচনা এবং রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে আবির্ভাবের ফলে বাংলা নাটক রচনা এবং বাংলা নাটকের অভিনয় ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হয়।

জাতীয় নাট্যশালার মাধ্যমে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন গোড়াতেই স্তব্ধ করে দেওয়া হয় নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মধ্য দিয়ে। দেশে স্বাদেশিকতার উন্মেষ এবং পরাধীনতার বেদনা থেকে মুক্তির যে শুভ সূচনা সাধারণ রঙ্গালয়ের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল, সন্ত্রস্ত ইংরেজ সরকার অঙ্কুরেই বিনাশ করার জন্য এই আইনের প্রবর্তন করে। এই আইনের বলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সাধারণ রঙ্গালয়। ১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠাকালে যে সকল নাট্যরসিক যুব সম্প্রদায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন চালু হবার পর বিপদগ্রস্ত গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭৬ সালের ২৫ আগস্ট পর্যন্ত টানা সাত মাস অভিনয় বন্ধ থাকে। রঙ্গমঞ্চে স্থিতাবস্থা ছিল ১৮৮০ সাল

পর্যন্ত। প্রতাপচাঁদ জহুরি ন্যাশনাল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন এবং ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছিলন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। প্রথম এখানে হাসির নাটক অভিনীত হয় ১৮৮১ সালের পয়লা জানুয়ারি। উপযুক্ত নাটকের অভাবে গিরিশচন্দ্র নিজেই নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। নাটক রচনার পূর্বে তিনি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং অভিনয়ও করেছিলেন। তাই তিনি দর্শক রুচি ও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন —

> "গিরিশচন্দ্রের পূর্বে বাংলার নাট্যভারতী অভিজাতের অন্তঃপুরে ভীরু পদক্ষেপে সঞ্চালন করিতেছিলেন। গিরিশচন্দ্রই সর্বপ্রথম তাঁহাকে প্রকাশ্য দরবারে আনিয়া তাঁহার অনিন্দ্য সৌন্দর্য ও অপূর্ব মহিমা সর্ব সমক্ষে অনাবৃত করিয়া দিলেন। ... গিরিশচন্দ্র এবং তাঁহার সহযোগিবৃন্দ দ্বারা বাংলাদেশের নাটকীয় আন্দোলন চূড়ান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ছিল। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা, রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা এবং অভিনয়শিল্পের শিক্ষাদানে গিরিশচন্দ্রের সমকক্ষ লোক বাংলায় কেহ জন্মান নাই।"[১৫]

গিরিশচন্দ্র যে সময়ে নাটক রচয়িতার আসনে অধিষ্ঠিত হলেন তখন বাংলা নাট্য সাহিত্যের শৈশব ও কৈশোর অতিক্রান্ত হয়ে যৌবনের সূচনা হয়েছে। দর্শকের ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি ও রঙ্গালয় গুলিকে নতুন রসে সঞ্জীবিত করার আশা নিয়ে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর অক্লান্ত লেখনি দ্বারা অবিরামভাবে নিত্য নতুন নাটক সৃষ্টি করে চলেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ড. অজিতকুমার ঘোষ তাঁর 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' গ্রন্থে গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যপ্রতিভা প্রসঙ্গে অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন তা উদ্ধৃত করলে কোনো অত্যুক্তি হয় না-

"অপরেশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎশর' নামক পুস্তকে বলিয়াছেন- গিরিশচন্দ্র এদেশের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মানে তিনি অন্য দ্বারা ইহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন বরাবর স্বাস্থ্যকর আহার দিয়া ইহাকে পরিপুষ্টি করিয়াছিলেন ইয়ার করিয়া ইহাকে আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। আর এই জন্যই গিরিশচন্দ্র Father of the Native stage – ইহার খুড়া জ্যাঠা কেহ কোনদিন ছিল না।"[১৬]

গিরিশচন্দ্র ছিলেন যথার্থই বাংলা জাতীয় নাট্যকার। পাশ্চাত্য আদর্শে উদ্বুদ্ধ মাইকেল ও দীনবন্ধু প্রবর্তিত ধারার সঙ্গে মনোমোহন বসু প্রমুখ নাট্যকারগণ প্রবর্তিত 'নতূন যাত্রা' বা গীতাভিনয় ধারার মধ্যে যোগ স্থাপন করাই তাঁর জীবনের সর্ব প্রধান কীর্তি। তিনি পৌরাণিক নাটকের ভিতর দিয়ে বাংলারই পুরাণ কথা প্রচার করেছেন। তিনি হিন্দু সংস্কৃতির মৌলিক আদর্শ সন্ধান করেছেন। তিনি হিন্দু সংস্কৃতির মৌলিক আদর্শ সন্ধান করেছেন বাল্মীকির পরিবর্তে কৃত্তিবাস, বেদব্যাসের পরিবর্তে কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, রামেশ্বর, ভারতচন্দ্রকে অবলম্বন করে। তিনি প্রায় শতাধিক নাটক রচনা করেছেন। তাঁর লেখা নাটকগুলির কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

গীতিনাট্য- 'আগমনী', 'অকালবোধন', 'দেবলীলা', 'মোহিনী প্রতিমা', 'আবু হোসেন' যথার্থ সার্থক গীতিনাট্য। ভক্তিমূলক ও পৌরাণিক নাটক- 'রাসলীলা', 'রাবণ বধ', 'অভিমুন্য বধ', 'সীতার বনবাস', 'পাণ্ডবদের অজ্ঞাত বাস', 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'চৈতন্যলীলা', 'বুদ্ধদেব চরিত', 'বিল্ব মঙ্গল', 'পাণ্ডব গৌরব' এই শ্রেণির নাটকগুলির মধ্যে কতকগুলি অবতার ও মহাপুরুষ বিষয়ক। রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্য লাভের পর গিরিশচন্দ্র মহামানবের মধ্যেই দেবতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'জনা' শ্রেষ্ঠ। 'বিল্বমঙ্গল' সে সময়

নাট্যমঞ্চে ভক্তিরসের প্লাবনের ঢেউ তুলেছিল। সাহিত্য ও সমাজের দিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে রামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দ যে আদর্শের পরিচয় বাঙালির সম্মুখে স্থাপন করেছিলেন সেই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলা নিজস্ব পৌরাণিক মহিমা কীর্তন করে সমাজের চিরাচরিত কুপ্রথাগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

দেশপ্রেম মূলক ইতিহাস আশ্রয়ী নাটক- 'আনন্দ রহো', 'কালাপাহাড়', 'ভ্রান্তি', 'সৎনাম', 'সিরাজউদ্দৌলা', 'মীরকাশিম', 'ছত্রপতি শিবাজী', 'অশোক'। দেশ-প্রেমমূলক ইতিহাস আশ্রয়ী নাটকের নাট্যকার ভারতবর্ষের ইতিহাসের বীর নায়কদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। শিক্ষিত মানুষের সচেতনতা দেশাত্মবোধ জাতীয়তাবাদ তাঁর এই সব নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সিরাজউদ্দৌলার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক।

সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল', 'হারানিধি', 'মায়াবন', 'বলিদান', 'শাস্তি কি শান্তি', 'গৃহলক্ষী' গিরিশচন্দ্র তাঁর সামাজিক নাটকগুলিতে অর্থনৈতিক ও পারিবারিক ভাঙ্গন, নারীর বিবাহ, বৈধব্য, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। প্রফুল্ল তাঁর শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক। সামাজিক নাটক রচনায় তাঁর কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল না, কারণ বাস্তব সমাজ সমস্যা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। চরিত্র-চিত্রণে দুর্বলতার প্রকাশের মধ্য দিয়ে তা ধরা পড়ে।

রঙ্গকৌতুকমূলক ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন 'ভোটমঙ্গল', 'হীরার ফুল', 'সভ্যতার পাণ্ডা', 'সপ্তমীতে বিসর্জন', 'বেল্লিক বাজার', 'বড়দিনের বকশিস'। তাঁর প্রহসনে কশাঘাতের তীব্র আঘাত আছে, স্নিগ্ধ অনাবিল হাস্যরসের উচ্ছল প্রবাহ নেই।

'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মেঘনাদবধ' কাব্য 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ', 'পলাশীর যুদ্ধ','চোখের বালি' প্রভৃতি উপন্যাস ও কাব্যের নাট্যরূপ তিনি দিয়েছেন। গিরিশ মানস সম্পর্কে উৎপল দত্ত বলেছেন—

> "আমাদের বহুদিন থেকে মনে হয়েছে গিরিশের নাটকের যে আর একটা স্তর রয়েছে, গভীরতর দিক রয়েছে সেটি পণ্ডিতদের দৃষ্টির বাইরে থেকে গেছে। অর্থাৎ মাঝে মাঝে ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করলেও এইসব পণ্ডিতদের "রসবোধের পরিধি" সে যুগের সবচেয়ে ইতর দর্শকের চেয়ে এক বিঘৎ বেশী নয়। তাঁরাও ঐ cheap sentimentality ও stage-trick এর চমকে হতবুদ্ধি হয়ে আছেন। গিরিশ-প্রতিভার মূল্যায়ন সুতরাং এঁদের হাতে হতে পারছে না।
>
> ... গিরিশ ভারতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তো বটেই, তাঁর কোনো কোনো রচনা বিশ্বনাট্য সাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য। আধুনিকতায় তিনি কখনো কখনো বের্টল্ট ব্রেখট-এর এপিক থিয়েটারে সমাবিষ্ট। জর্মন এক্সপ্রেশনিস্টদের আবির্ভাবের পূর্বেই তিনি এক্সপ্রেশনিজম-এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগকর্তা। মানস চরিত্রের জটিল ও দ্বন্দ্বময় বিকাশে তিনি কখনো বা শেক্সপীয়রের যোগ্য ছাত্র।"[১৭]

গিরিশচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁর গৈরিশ ছন্দ। ভাষা ছন্দের দিক দিয়ে তিনি বাংলা নাটকে সর্বাপেক্ষা বেশি সংস্কার করেছিলেন। মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতি নাট্যকারের গদ্য সংলাপ সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে নিতান্ত আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক ছিল। নাটকের ক্ষেত্রে দীনবন্ধু ব্যবহৃত এবং মাইকেল প্রবর্তিত চতুর্দশ অক্ষরবিশিষ্ট অমিত্রাক্ষর ছন্দ কোনোটাই অনুকূল ছিল না। কারণ এ দুই ছন্দে ভাবের দ্রুত ও অবিরাম গতি সম্ভব নয়। গিরিশচন্দ্রের

হাতেই নাটকীয় সংলাপ সর্বপ্রথম সচল ও সাবলীল গতি লাভ করেছিল। নাটকীয় চরিত্রগুলি তাদের নিজেদের ভাষা ব্যবহার করবার অধিকার পেয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের এই মৌলিক এবং নাটকীয় ছন্দের জন্যই তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলি ও গতানুগতিক একঘেয়েমির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

গৈরিশ ছন্দের প্রচলনের পূর্বে বাংলা নাটকে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্তক হলেন রাজকৃষ্ণ রায়। তিনি নাট্য রচনার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে মনোমোহন বসুর অপেরা জাতীয় নাটকের প্রতি প্রভাবিত হয়েছিলেন। মনোমোহন বসু যে গীতাভিনয় জাতীয় নাট্যধারার সূত্রপাত করেছিলেন তার এই পরিণতি রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটক। বীণা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা রাজকৃষ্ণ রায়ের নানা ধরনের নাটক পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণের প্রচলিত কাহিনি অবলম্বনে অধিকাংশ নাটক রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম নাটক 'পতিব্রতা'। পতি সেবার চরম আদর্শ সাবিত্রীকে কেন্দ্র করে পুরাণ আশ্রয়ী এই নাটক রচনা করেছিলেন। তিনি ইতিহাসের কাহিনি অবলম্বনে নাটক লিখলেও জাতীয়ভাব প্রচার তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না।

হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার সুবাদে জাতীয়তাবোধ জাগরণের প্রয়োজনে বাংলা নাটকে ঐতিহাসিক উপাদান ও নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ফলে পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে বাংলা নাটক জনগণের আগ্রহের মূল বস্তু হয়ে ওঠে। বাংলা নাটকের সেই সময়কার এক ব্যতিক্রমী পথের পথিক হলেন অমৃতলাল বসু। বাংলা নাটকে নাট্যকার হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে তিনি অভিনেতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পরে নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। মঞ্চের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত থাকার কারণে মঞ্চের চাহিদা এবং দর্শক রুচি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ অমৃতলাল পঞ্চরঙের প্রহসনকে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্রের সমকালে আবির্ভূত এই নাট্যকার প্রহসনে হাস্যরসের কারণে

'রসরাজ' নামে খ্যাত হয়েছিলেন। সমাজের নানা সমস্যা, চরিত্র সংশোধন ইত্যাদির কারণে তাঁর প্রহসন তীক্ষ্ণ ভাষায় কশাঘাত পূর্ণ বিদ্রূপাত্মক। প্রচলিত প্রহসনের ধারা অনুসারে তাঁর নাট্যপ্রতিভা স্বদেশপ্রীতি জাগ্রত থেকে বিরত থাকলেও তিনি প্রথম বাংলা নাটকের আঙ্গিক, রীতিনীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন যা তাঁর মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর।

অমৃতলাল যখন নাটক লিখছেন তখন নাটকের বৃত্ত নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। পাশ্চাত্যের নাট্যকার ইবসেনের প্রভাবে তখন কোন কোন নাটকের দৃশ্য বিভাগ তুলে দেওয়া হয়েছিল। অমৃতলালের নাটকে কোন অঙ্ক বিভাগ ও দৃশ্য বিভাগ নেই। তাঁর নাটক প্রবেশক, পূর্বচিত্র ও উত্তরচিত্র এই তিনটি ভাগে বিভক্ত, যা সংস্কৃত নাটক অনুসারী। তিনি তাঁর নাটকের শ্রেণি সম্পর্কে 'প্রমোদ প্রহসন' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর নাটকের মূল কাহিনি কৌতুকরসের উচ্ছ্বসিত ধারায় প্রবাহিত। তাঁর নাটকের হাস্যরস ঘটনাকেন্দ্রিক নয়, চরিত্রকেন্দ্রিক।

উনিশ শতকের জাতীয় ভাবাত্মক ঐতিহাসিক নাটক রচনার পিছনে যেমন নবোত্থিত জাতীয় প্রেরণার অস্তিত্ব ছিল, বিশ শতকের সূচনায় ঐতিহাসিক নাটকের গৌরবময় পুনঃপ্রতিষ্ঠার পিছনেও তেমনি এক স্মরণীয় জাতীয় আন্দোলনের অনিবার্য প্রভাব ছিল। উনিশ শতকের জাতীয় চেতনা স্বদেশব্রতী মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষিত মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিশ শতকের গোড়ায় তা এক ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনের রূপ লাভ করে। আপামর সাধারণ মানুষ একজোটে পথে নামে। এর থেকে পিছিয়ে থাকে না নাট্যকারগণও। যে ধর্মানুসন্ধ দৃষ্টি অলৌকিক দেবলীলার মধ্যে নিমগ্ন ছিল তা মুক্ত সন্ধানী দৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়ে লৌকিক মানবলীলা নিবদ্ধ হয়। ১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা ফলে যে চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল, ১৮৭৬ সালের নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন দ্বারা তা রোধ করা হয়। ফলে বাঙালির স্বভাবজাত পৌরাণিক ভক্তিমূলক নাটকের হাত ধরে বাংলা নাটক

পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। গিরিশচন্দ্রের হাতে বাংলা নাটকের স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গবিচ্ছেদের পরিকল্পনা মানুষকে ভক্তিমূলক ভাব জগৎ থেকে কঠোর সংগ্রামের ক্ষেত্রে পদার্পণ করতে বাধ্য করে। এক অভূতপূর্ব জাতীয় মাদকতায় দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মেতে উঠেছিল। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণ জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে জাতীয় ভাবোদ্দীপনার নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। দর্শক তাদের রাষ্ট্রিক সংগ্রামের প্রেরণা নাটকের মধ্যে খুঁজে পায় এবং বিপুল উৎসাহে সেই নাটককে তারা সম্বর্ধনা জানায়। আনন্দরসের প্রেক্ষাগৃহ ও আন্দোলনে রাজপথ এক প্রাণের যোগে সম্মিলিত হয়ে ওঠে। জাতীয় ইতিহাসে বর্ণিত ঐতিহাসিক বীরপুরুষদের সংগ্রাম ও তাদের আত্মোৎসর্গের কাহিনি স্বদেশ প্রেমীদের মধ্যে জীবন্ত প্রেরণা এনে দেয়। এই সময়কালে বাংলা নাটকের স্বর্ণযুগের সূচনা ও ব্যাপ্তি। স্বর্ণযুগে আবির্ভূত জাতীয় মুক্তিযোদ্ধার ঋত্বিক হলেন গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ নাট্যকারগণ। গিরিশচন্দ্র খ্যাতি ভক্তিমূলক নাটক রচনায় হলেও তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের সময়কাল এই সংগ্রামীশীল জাতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। বাংলার ঐতিহাসিক নাটকের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রাপ্য। প্রথমে হাসির গান রচয়িতা এবং প্রহসনকার হিসেবে বাংলা নাট্য জগতে তাঁর আবির্ভাব। তিনি আধুনিক বিশ্ব নাট্যকলার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত ছিলেন। সে জন্য তিনি বাংলা নাটকের প্রথা স্বগতোক্তি পরিবর্জন পূর্বক ইবসেন, বার্নার্ড শ প্রমুখ পাশ্চাত্য নাট্যকারদিগের মঞ্চ ব্যবস্থা, রঙ্গমঞ্চ উপযোগী নাট্য নির্দেশ এবং অভিনেতার স্বভাবের অভিব্যক্তি ও তার চতুর্পার্শ্বস্থ পরিবেশ ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর নাটক।

বিশ শতকের প্রথম দশককে ঐতিহাসিক নাটকের স্বর্ণযুগ বলা হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে তার চরম সার্থকতা। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশের অভ্যন্তরে যে তুমুল বিক্ষোভ প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এই সমস্ত জাতীয়তাবোধ উদ্দীপক নাটক তাকে শক্তিশালী রাখতে সক্ষম হয়েছিল। যে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল প্রতাপাদিত্য নাটকে তার পূর্ণরূপ

দেখা গেল প্রতাপ সিংহ, দুর্গাদাস, মেবারপতন, প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকে। দ্বিজেন্দ্রলাল পরাধীনতার খুব জ্বালা ও অপরিসীম বেদনার কথা ফুটিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের জাতীয় আশা ও আলোর চিত্র অঙ্কন করে দেখিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক নাটকের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বাধিক জনপ্রিয়। তাঁর নাটকের মহাপ্রাণেরর আত্ম বলিদানের সঙ্গীত এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের মধ্যে মর্মান্তিক করুণা প্রকাশের পাশাপাশি আত্মোৎসর্গের মহিমা, স্বার্থত্যাগের গৌরবে মন ভরে ওঠে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জীবনকে দেখেছিলেন পরিপূর্ণরূপে। সেজন্য তাঁর নাটকে বহির্জগতের বিবাদ অপেক্ষায় চরিত্রের অন্তর্জগতের বিপ্লব প্রধান হয়ে উঠেছিল। মানবতার গৌরবের প্রতীক নবজাগ্রত কৌতূহল চরিত্রের অবতারণা গতিবেগ ও ভাবসঙ্গতির দিকে মনোযোগ, রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগস্থাপনা এসব দিক দিয়ে তাঁর নাটকে আধুনিকতা আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। প্রহসনের হাত ধরে বাংলা নাটকে তার পদার্পণ ঘটলেও হাসির সঙ্গে সামাজিক বিষয়, ব্যঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা তাঁর মনের মধ্যে এমন একটা জগৎ সৃষ্টি হয়েছিল যা তাঁকে প্রহসন রচনা প্রেরণা যুগিয়েছিল। বিলাত থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে তিনি দেশে ফেরার পর সমাজবিরোধীদের হাতে লাঞ্ছনায় তাঁর মনে একটা সুগভীর ধিক্কার জন্মেছিল। এর সঙ্গে তাঁর অকৃত্রিম দেশাত্মবোধ যুক্ত হওয়ার ফলেই তিনি নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। যার ফলস্বরূপ বাংলা নাটকের ইতিহাসে স্বর্ণ যুগের সুত্রপাত হয়। তিনি সৃষ্টি করেন তাঁর অমর নাট্য সম্ভার। একঘরে, কল্কী অবতার, প্রায়শ্চিত্ত, পুনর্জন্ম, আনন্দ বিদায় প্রভৃতি প্রহসনগুলি তাঁর অভিনবত্বের দাবি রাখে। জাতীয় ইতিহাসের কাহিনি অবলম্বনে স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত ‘তারাবাঈ’, ‘প্রতাপ সিংহ’,’ দুর্গাদাস’, ‘নুরজাহান’, ‘মেবার পতন’, ‘শাজাহান’, ‘চন্দ্রগুপ্ত’, ‘সিংহল বিজয়’ তাঁর ঐতিহাসিক নাটক। ‘পাষাণী’, সীতা, ‘ভীষ্ম’ এই তিনটি নাটক রচনা করেছেন যার মধ্যে পৌরাণিক কাহিনিকে মানবতার রঙে

রাঙিয়ে আধুনিক রূপে পরিবেশন করেছেন। এছাড়া 'পরপারে' ও 'বঙ্গনারী' নামে দুটি সামাজিক রচনার পর তাঁর নাট্য প্রতিভা অস্তমিত হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সমকালে আবির্ভূত বাংলা নাটকের স্বর্ণযুগের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদও স্বদেশী ভাব প্রেরণা নিয়ে নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর 'প্রতাপাদিত্য', 'আলমগীর', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি নাটক জাতীয়ভাবে উদ্দীপিত, দর্শকদের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ভাবাদর্শের দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তাঁর গুরুতর পার্থক্য ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের মতো তাঁর দৃষ্টি বস্তুজগতে নিবদ্ধ ছিল না। তাঁর দৃষ্টি অলৌকিক জগতের রহস্য ও মহিমায় কৌতূহলী ছিল। তিনি আধুনিক উদার মতবাদে বিশ্বাসী হয়েও ধর্ম ও শাস্ত্র নির্দেশিত পুরাতন মোহকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি গিরিশচন্দ্রের আদর্শের অনুসারী। ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর নাটকের চরিত্র অপেক্ষা কাহিনি বর্ণনায় প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি একটু অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য, বিবর্ণ। প্রায়ই চরিত্রগুলি অন্তর্নিহিত রহস্যে জটিল, ভাবাতুর ও অব্যবস্থিত চিত্ত। এ প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন–

> "ক্ষীরোদ প্রসাদ নাটক রচনার প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে কাহিনির মনোহারিত্ব অর্থাৎ প্লটের গল্পরস। গিরিশচন্দ্র ভক্তিরসোচ্ছ্বাসের বন্যা আনিয়াছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ তাহা প্রতিরোধ করিয়াছিলেন নাট্য কাহিনিকে সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জন করিয়া।"[১৮]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিভিন্ন ধরনের প্রায় অর্ধশত নাটক রচনা করেছেন, আরব তুরস্কের কাহিনি নিয়ে বেশ কয়েকটি নাটিকাও তিনি রচনা করেছেন। এই শ্রেণির ক্ষুদ্র নাটকগুলি গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবজাত ফসল। 'সপ্তম প্রতিমা', 'রঘুবীর', 'রঞ্জাবতী', 'দৌলতে দুনিয়া' এই শ্রেণির নাটিকা।

ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় রঙ্গনাট্য ও গীতিনাট্য শ্রেণির রচনাগুলির মধ্যে। এগুলি মঞ্চ সফল নাটক। এর কাহিনি রূপকথার প্রচলিত উদ্ভট ও অসম্ভব রোমাঞ্চকর কাহিনি। 'আলিবাবা', 'কিন্নরী', 'জুলিয়া', 'বিদৌরা', 'বৃন্দাবন বিলাস', 'বাসন্তী', 'বরুণা', 'ভূতের বেগার', 'পলিন', 'মিডিয়া' এই শ্রেণির রচনা। 'আলিবাবা' এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। তিনি কয়েকটি পৌরাণিক নাটকও রচনা করেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক নাটক প্রসঙ্গে লিখেছেন —

> "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের মধ্যভাগ হইতে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যকার-জীবনের সূত্রপাত হইলেও, বিংশতি শতাব্দীর প্রথমভাগেই তিনি তাঁহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যানুযায়ী নাটক রচনা করিয়া বাঙ্গালী নাট্যামোদীদিগের চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন। ... একদিক দিয়ে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে ক্ষীরোদপ্রসাদকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্য ও আধুনিক যুগের মধ্যে যোগরক্ষাকারী বলিয়াও নির্দেশ করিতে পারা যায়। মধ্যযুগের পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নাটক রচনার ধারাটি যেমন তিনি আধুনিক যুগ পর্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন, তেমনই আধুনিক যুগের আত্মসচেতনতার দ্বারাও তিনি তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলিকে একটি বিশেষত্ব দান করিয়াছিলেন।"[১৯]

বভ্রুবাহন, সাবিত্রী, উলুপী, ভীষ্ম, মন্দাকিনী ও নরনারায়ণ তাঁর পৌরাণিক নাটক। নরনারায়ণ তাঁর শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের যুগের তিনি অনেকগুলো ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন। প্রতাপাদিত্য, পলাশী প্রায়শ্চিত্ত, পদ্মিনী, অশোক, চাঁদবিবি, বাংলার মসনদ,

আলমগীর, রঘুবীর তাঁর উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটক। তাঁর 'প্রতাপাদিত্য' নাটক সম্পর্কে ড. অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন —

> "বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যে জাতীয় মন্ত্রপূত অনুপ্রাণনাময় নাটকাবলীর প্রণয়ন হইয়াছিল তাহার সূচনা ক্ষীরোদ প্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকেই হইয়াছিল।"[২০]

এছাড়া খাজাখান, আহেরিয়া, বঙ্গে রাঠোর তাঁর কাল্পনিক ইতিবৃত্ত মূলক রচনা।

ইতিমধ্যে বাংলা নাটকে কতকগুলি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। প্রায় একই সময়ে বাংলা নাটক থেকে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল এই দুই মহান প্রতিভার তিরোধান ঘটে। এর কিছু পূর্ব হতে বাংলা নাটক রবীন্দ্রনাথের হাতে স্বতন্ত্র ধারায় পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। সে সম্পর্কে পরবর্তী পর্বে আলোচিত হয়েছে। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর নিজস্ব নাট্য সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন তখন তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য নাট্যকারগণ সাধারণ রঙ্গমঞ্চের জন্য নাটক রচনা করে জনসমর্থনের লাভ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র তিরোধানের পর নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের যুগ শুরু হয়। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সূর্য চৌধুরী, নির্মলা মিত্র, দূর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশ চৌধুরী প্রমুখ অসাধারণ শক্তিশালী অভিনেতাদের আবির্ভাবে বাংলা নাট্যশালা ধন্য হয়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এই সময়ের সাধারণ নাট্যশালার জন্য প্রথম দিকে দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমরেন্দ্র নাথ প্রমুখ নাট্যকারগণ নাটক রচনা করেন এবং শেষ দিকে তাঁদের নাট্যধারা কিছুটা অনুসরণ করে এবং নবযুগের চিন্তা ধারায় নতুন নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটে।

দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্ পর্বে যে কয়েকজন প্রতিভাবান প্রগতিশীল নাট্যকার পরাধীনতার গ্লানি, স্বদেশ প্রাণতা, জাতীয় ভাবোন্মাদনা, স্বাধীনতার

স্পৃহা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বাংলা নাটককে সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন মন্মথ রায়, যোগেশ চৌধুরী, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নিশিকান্ত বসু, বিধায়ক ভট্টাচার্য, জলধর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে মন্মথ রায়। তাঁর 'কারাগার' নাটকে তিনি পৌরাণিক কাহিনির অন্তরালে তৎকালীন রাজনৈতিক ভাবমূর্তিকে তুলে ধরেছিলেন। এছাড়া 'চাঁদ সদাগর', 'দেবাসুর', 'সাবিত্রী' পৌরাণিক নাটকের ধারায় উল্লেখযোগ্য। অবশ্য মন্মথ রায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বেও কতকগুলি নাটক রচনা করেছেন। যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা' নাটক পৌরাণিক নাটকের ধারাকে সচল রেখেছে।

ঐতিহাসিক নাটকের ধারায় শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা' স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় জাতীয় চেতনা ও গৌরববোধ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে জনগণের চিত্তে গভীর আবেদন সৃষ্টি করে। তাঁর নাটক আধুনিক নাট্যরীতির ছোঁয়ায় জটিল হয়ে উঠেছে। এছাড়া তাঁর 'সিরাজউদ্দৌলা', 'রাষ্ট্রবিপ্লব', 'ধাত্রীপান্না', ঐতিহাসিক নাটকের ধারাকে বিশ শতকের তৃতীয় দশকেও গতিশীল রেখেছিল। মন্মথ রায়ের খনা, অশোক, মীর কাশিম; মহেন্দ্র গুপ্তের 'টিপুসুলতান', 'পাঞ্জাব কেশরী রঞ্জিত সিং', নিশিকান্ত বসু রায়ের 'বঙ্গে বর্গী' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্ পর্বে ভারতের স্বাধীনতাকামী স্বদেশ ব্রতীদের হৃদয়ে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলে। সামাজিক নাটক রচনার মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকজন নাট্যকার বাংলা নাটকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম - বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর', 'মেঘমুক্তি', 'তাইতো', 'বিশ বছর আগে' প্রভৃতি।

বিশ শতকের গোড়া থেকেই আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের অস্থিরতার কারণে জীবন ধারণ প্রণালীর জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমে ক্রমে সময় সচেতন হয়ে ওঠে। আর্থিক সংকটতার জন্য মানুষের মন অসন্তুষ্ট ও সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ে। এর ফলে নানা অভিনব

মতবাদ প্রচলিত সমাজব্যবস্থা রীতিনীতির প্রতি মানুষ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মানুষের জীবনে শান্তিপূর্ণ সুনিশ্চিত আরাম অতিক্রান্ত হয়। বার্নাড শ, হেনরিক ইবসেন প্রভৃতি বিশ্ব বিখ্যাত নাট্যকারের নাটকে এই সমাজ জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাভাবিক কারণে বাংলা নাটকেও সামাজিক সমস্যার বহুল ব্যাপ্তি ও সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি এই সময়ে দেখা যায়। আধুনিক সামাজিক নাটক প্রণেতাদের অগ্রণী হলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। আধুনিক বাঙালি পরিবার যে সমস্ত সমস্যা দ্বারা বিচলিত তার বাস্তব চিত্র দেখিয়েছেন তিনি। তিনি কেবল সমাজ সমস্যাকে স্পর্শ করেনি। সমস্যার অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেছেন তার অনুভূতির আছে সমস্যা অভিষিক্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'মাটির ঘর' যা আধুনিক শ্রেষ্ঠ নাটকের অন্যতম। এছাড়া 'মেঘমুক্তি, 'তাইতো', 'বিশ বছর' আগে উল্লেখযোগ্য নাটক। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'স্বামী-স্ত্রী', 'তটিনীর বিচার', 'মাটির মায়া' বাংলা সামাজিক নাটকের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

তৃতীয় পর্ব : ১৮৭৬ সালে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারা বাংলা নাটকের কণ্ঠরোধ করার প্রচেষ্টা যখন গিরিশচন্দ্র দ্বারা ব্যাহত হয় পৌরাণিক নাটক রচনার মধ্য দিয়ে। ক্রমান্বয়ে তা সমসাময়িক সামাজিক আধ্যাত্মিক রাজনৈতিক চৈতন্য প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে। সূচনা হয় নাটকের স্বর্ণযুগের এরকম সময় কালে ১৮৬১ সালে বাংলা নাটকে আবির্ভাব ঘটে রবীন্দ্রনাথের। তাঁর নাটকের রচনাকাল দ্বিতীয় পর্বে সীমাবদ্ধ। ওই সময়কালে নাটক রচনা করেও তাঁকে স্বতন্ত্র পর্বে আলোচনা যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। তাঁর নাটকের পরিচয় সূত্রে তা বিশ্লেষণ করা হল। রবীন্দ্রনাথ যে যুগের প্রতিনিধি হয়ে বাংলা নাটকে আবির্ভূত হলেন তখন বাংলা নাটকে সামাজিক সংঘর্ষের বেশি প্রাধান্য। বিক্ষিপ্ত ঘটনার বৈচিত্র্যময় ঘাত-প্রতিঘাত থেকে নাটকের উপকরণ সংগৃহীত রবীন্দ্রপূর্ব এবং রবীন্দ্র-উত্তর সাম্প্রতিক কালের বাংলা নাটকের জনপ্রিয়তার সমসাময়িক যুগের বিশিষ্ট চিন্তাধারা প্রধান বাহক ছিল। অথচ রবীন্দ্রনাথ এই চিন্তাধারার গ্রহণ না করে তীব্র আত্মসচেতনতা দ্বারা সামাজিক প্রশ্নগুলির বিচার করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'অচলায়তন' নাটক উল্লেখযোগ্য।

তিনি সম্পূর্ণ অর্থ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার না করে তাঁর ব্যক্তিগত আদর্শবোধ দ্বারা বিচার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে নাট্যকার সত্তা বিদ্যমান ছিল তা সর্বদা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত শিল্পীর আত্মপ্রতিষ্ঠিত ও অনায়ত্ত রূপ সুষমার অনুসন্ধানে অস্থির। তিনি তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের অনুরূপ আদর্শ নাট্য সংরূপ সন্ধানের প্রয়াসে কাব্য-কবিতার ন্যায় নাটক রচনায়ও প্রায় দীর্ঘ ষাট বছর ব্যাপৃত থেকেছেন। দীর্ঘ এই ষাট বছর নাটক পরিক্রমায় তাঁর 'বাল্মীকি প্রতিভা' থেকে নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' পর্যন্ত বাংলা নাটকের এক স্বতন্ত্র ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সমগ্র ব্যক্তি জীবন পরিপূর্ণ এক সার্থক পূর্ণাঙ্গ নাটক যা চন্ডীদাসের রাধার মতো ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়ে মধুর পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটেছে। এমনকি যে রূপ ও নাট্যকার কবি প্রতিকৃতির সঙ্গে একাত্ম সেখানে তিনি নতুন নতুন কল্পনার অঙ্কুশ তাড়িত নতুন ভাব কেন্দ্রের চারিদিকে আবর্তিত। তিনি নাটক লিখতে গিয়েও আত্মকেন্দ্রিকতার গণ্ডী থেকে সরে আসতে পারেননি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি একটি মূর্ত ভাববিগ্রহ, কবির বিদ্রোহী চেতনার এক একটি অর্থ পরিস্ফুট মানবিক প্রতীকে পরিস্ফুট অসম্পূর্ণ প্রয়াসের খণ্ডাংশ বিকীর্ণ। বাংলা নাটকের মন্দির প্রাঙ্গণে তাঁর প্রতিভার দীপ্তি। তাই তাঁর নাটক রূপ থেকে রূপান্তরে চালিত। রবীন্দ্রনাথের নাট্য সাহিত্য সৃষ্টি এতই অভিনব এত বিচিত্র এতই সমৃদ্ধ যে তা যেমন তাঁর পূর্ববর্তী যুগের থেকে পৃথক তেমনি তাঁর পরবর্তীকালে সাম্প্রতিক নাটক থেকেও ভিন্ন। রবীন্দ্রনাটক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পূর্বাপর সম্পর্কহীন রবীন্দ্র ব্যক্তি মানুষের এক অভিনব সৃষ্টি। এর মধ্যে যে বিস্তৃতি বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি আছে তার দ্বারা ইহা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তাই রবীন্দ্রনাথকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগের সর্বপ্রধান প্রতিনিধি বলে নির্দেশ করা চলে। রবীন্দ্রনাট্য প্রতিভা সম্পর্কে ড. অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন—

> "রবীন্দ্রনাথ আসিবার ফলে বাংলা নাটক তাহার পরিপূর্ণ আভিজাত্য এবং গৌরভ লাভ করিল। নাটকের মধ্যে তিনি যে সূক্ষ্ম কলাকৌশল এবং সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির সুস্পষ্ট পরিচয় দিলেন তাহা তাহার পূর্বে দেখা যায় নাই, এবং পরেও অনুসৃত হয় নাই। তাহার নাটক এখনো ব্যাপক সর্বজন সমাজের লাভ করিতে পারে নাই, তাহার কারণ দর্শকদের মন এখনো যোগ্য ও প্রস্তুত হয় নাই। ভাবী কালের অনাগত সমাজে ইহার প্রকৃত মূল্য অনুভূত হইবে, তখন লোকে সমস্বরে স্বীকার করিবে– রবীন্দ্রনাথ বাংলার শুধু শ্রেষ্ঠ কবি নহেন, তিনি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারও বটে।"[২১]

ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতার এক ধনাঢ্য সংস্কৃতিবান পিরালি ব্রাহ্মণ পরিবারে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। ১৮৭৪ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রথম তাঁর 'অভিলাষ' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে তিনি হয়ে ওঠেন বাংলা ও বাঙালির মেধা-মননের অগ্রদূত, দর্শন ও আদর্শের পথিকৃৎ।

নাটক তথা কথাসাহিত্য এবং প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি সমাজ, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে নিজ মতামত প্রকাশ করেছিলেন। গ্রামীণ উন্নয়ণ ও গ্রামীণ জনসমাজে শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে সার্বিক সমাজকল্যাণের তত্ত্ব প্রচার করতেন তিনি। পাশাপাশি সামাজিক ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

সাহিত্য সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় সোনালী ফলনের পাশাপাশি প্রবর্তন করেছেন নতুন নতুন ধারা। কবিগুরুর একটি বিশেষ সত্তা ছিল নাটকে। তিনি ছিলেন ছিলেন একজন বিদগ্ধ নট ও নাট্যকার। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক নাট্যমঞ্চে মাত্র ষোলো বছর বয়সে অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'হঠাৎ নবাব' নাটকে (মলিয়ের লা বুর্জোয়া

‘জাঁতিরোম’ অবলম্বনে রচিত) ও পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই ‘অলীকবাবু’ নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৮৮১ সালে তাঁর প্রথম গীতিনাট্য ‘বাল্মীকি-প্রতিভা’ মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে তিনি ঋষি বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ১৮৮২ সালে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের উপাখ্যান অবলম্বনে ‘কালমৃগয়া’ নামে আরও একটি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। এই নাটক মঞ্চায়নের সময় তিনি অন্ধমুনির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

গীতিনাট্য রচনার পর রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কাব্যনাট্য রচনা করেন। শেকসপিয়রীয় পঞ্চাঙ্ক রীতিতে রচিত তাঁর ‘রাজা ও রাণী’ (১৮৮৯) ও ‘বিসর্জন’ (১৮৯০) বহুবার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় এবং তিনি নিজে এই নাটকগুলিতে অভিনয়ও করেন। ১৮৮৯ সালে ‘রাজা ও রাণী’ নাটকে বিক্রমদেবের ভূমিকায় অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথ। ‘বিসর্জন’ নাটকটি দুটি ভিন্ন সময়ে মঞ্চায়িত করেছিলেন তিনি। ১৮৯০ সালের মঞ্চায়নের সময় যুবক রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ রঘুপতির ভূমিকায় এবং ১৯২৩ সালের মঞ্চায়নের সময় বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ যুবক জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। কাব্যনাট্য পর্বে রবীন্দ্রনাথের আরও দুটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২) ও মালিনী (১৮৯৬)।

কাব্যনাট্যের পর রবীন্দ্রনাথ প্রহসন রচনায় মনোনিবেশ করেন। এই পর্বে প্রকাশিত হয় ‘গোড়ায় গলদ’ (১৮৯২), ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’ (১৮৯৭), ‘হাস্যকৌতুক’ (১৯০৭) ও ‘ব্যঙ্গকৌতুক’ (১৯০৭)। ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’ নাটকে রবীন্দ্রনাথ কেদারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি ‘প্রজাপতির নির্বন্ধ’ উপন্যাসটিকেও ‘চিরকুমার সভা’ নামে একটি প্রহসনমূলক নাটকের রূপ দেন।

১৯০৮ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ রূপক-সাংকেতিক তত্ত্বধর্মী নাট্যরচনা শুরু করেন। ইতিপূর্বে ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ (১৮৮৪) নাটকে তিনি কিছুটা রূপক-সাংকেতিক আঙ্গিক ব্যবহার করেছিলেন। কি ১৯০৮ সালের পর থেকে একের পর এক নাটক তিনি এই

আঙ্গিকে লিখতে শুরু করেন। এই নাটকগুলি হল: 'শারদোৎসব' (১৯০৮), 'রাজা' (১৯১০), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'অচলায়তন' (১৯১২), 'ফাল্গুনী' (১৯১৬), 'মুক্তধারা' (১৯২২), 'রক্তকরবী' (১৯২৬), 'তাসের দেশ' (১৯৩৩), 'কালের যাত্রা' (১৯৩২) ইত্যাদি। এই সময় রবীন্দ্রনাথ প্রধানত শান্তিনিকেতনে মঞ্চ তৈরি করে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অভিনয়ের দল গড়ে মঞ্চস্থ করতেন। কখনও কখনও কলকাতায় গিয়েও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করতেন তিনি। এসব নাটকেও একাধিক চরিত্রে অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথ। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ১৯১১ সালে 'শারদোৎসব' নাটকে সন্ন্যাসী এবং 'রাজা' নাটকে রাজা ও ঠাকুরদাদার যুগ্ম ভূমিকায় অভিনয়; ১৯১৪ সালে 'অচলায়তন' নাটকে অদীন পুণ্যের ভূমিকায় অভিনয়; ১৯১৫ সালে 'ফাল্গুনী' নাটকে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অভিনয়; ১৯১৭ সালে 'ডাকঘর' নাটকে ঠাকুরদা, প্রহরী ও বাউলের ভূমিকায় অভিনয়। নাট্যরচনার পাশাপাশি এই পর্বে ছাত্র ছাত্রীদের অভিনয়ের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ পুরনো নাটকগুলি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করে নতুন নামে প্রকাশ করেন। 'শারদোৎসব' নাটকটি হয় 'ঋণশোধ' (১৯২১), 'রাজা' হয় 'অরূপরতন' (১৯২০), 'অচলায়তন' হয় 'গুরু' (১৯১৮), 'গোড়ায় গলদ' হয় 'শেষরক্ষা' (১৯২৮), 'রাজা ও রাণী' হয় 'তপতী' (১৯২৯) এবং 'প্রায়শ্চিত্ত' হয় 'পরিত্রাণ' (১৯২৯)। ১৯২৬ সালে 'নটীর পূজা' নাটকে প্রথম অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাচ ও গানের প্রয়োগ ঘটান রবীন্দ্রনাথ। এই ধারাটিই তাঁর জীবনের শেষ পর্বে "নৃত্যনাট্য" নামে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। নটীর পূজা নৃত্যনাট্যের পর রবীন্দ্রনাথ একে একে রচনা করেন 'শাপমোচন' (১৯৩১), 'তাসের দেশ' (১৯৩৩), 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা' (১৯৩৮) ও 'শ্যামা' (১৯৩৯)। এগুলিও শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছাত্রীরাই প্রথম মঞ্চস্থ করেছিলেন।

পরবর্তীকালে দীর্ঘ একটা সময় উপনিবেশিকতা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামীর কবলে পড়ে রবীন্দ্র নাটক তথা বরীন্দ্র সাহিত্যে অনেকটা স্থবিরতা দেখা দেয়। সময়ের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন আস্থার আশ্রয়। অ্যাভনের রাজহংসের মতো জোড়াসাঁকোর রবিও

ছিলেন একাধারে সফল কবি ও সার্থক নাট্যকার। রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রচলিত প্রথার অনুগামী নয়। বরং স্বকীয় জীবনচেতনার অঙ্গীরসে জারিত এই নাটকগুলি তাঁর শিল্পীসত্তার আত্মপ্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপীয় ভাবাদর্শের প্রভাবে একটি নতুন নাট্যচেতনা বিকাশলাভ করেছিল ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গনে। এই ভাবে দীক্ষিত হয়েছিলেন সদ্যযুবক রবীন্দ্রনাথও। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে নব নব সৃষ্টিলীলায় বাংলা নাট্যসাহিত্যে অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য এনেছিলেন তিনি। এই বৈচিত্র্য শুধু বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধই করেনি, বরং 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে' মজে থাকা রাঢ় ও বঙ্গের যুগরুচি সংস্কারে, এবং তা বিশ্বমননের উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের মৌলিক নাটকের সংখ্যা ৩৮। এই নাটকগুলিকে কয়েকটি বর্গে বিভক্ত করা যায়। যেমন: গীতিনাট্য, নিয়মানুগ নাটক, কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য, প্রহসন-কৌতুকনাট্য ও রূপক-সাংকেতিক নাটক। নাট্যমঞ্চে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব তাঁর গীতিনাট্যের হাত ধরে। এই নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথের সুরস্রষ্টা (composer) ও নাট্যকার প্রতিভার যুগপৎ সমাহার লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সৃষ্টি 'বাল্মীকি-প্রতিভা' (১৮৮১) ও 'কালমৃগয়া' (১৮৮২)। দু'টি নাটকই কৃত্তিবাসী রামায়ণের দু'টি পৃথক কাহিনি অবলম্বনে রচিত। এই দু'টি নাটক এবং 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮) রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ গীতিনাট্যের উদাহরণ। উল্লেখ্য, 'মায়ার খেলা'র আখ্যানভাগ রবীন্দ্রনাথের স্বকল্পিত। এই নাটকে সংগীতের জালে বাঁধা পড়েছে এক জটিল প্রেমের কাহিনি।

রবীন্দ্র-গীতিনাট্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য গীতিপ্রাণতা। নাটকের সংলাপগুলি সবই গানে বাঁধা। ইতালীয় অপেরা ও আইরিশ মেলোডিজ এই গানগুলির অনুপ্রেরণা। আর এক অনুপ্রেরণা দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গান ও সুর। নিজের আত্মকথাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অবশ্য এও দাবি করেছেন যে, 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র সুরকার তিনিই। সে যাই হোক, জীবন প্রভাতের

গীতিনাট্যের মাধ্যমে যে বীজ রবীন্দ্রনাথ রোপণ করেছিলেন, তার পরিপক্ক ফসল জীবন সায়াহ্নের নৃত্যনাট্য। আর গানকে তো সারা জীবনই রবীন্দ্রনাথ নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ মনে করেছেন।

প্রায় একই সময়ে গীতিপ্রাণতা থেকে কিছুটা মুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথানুগ অর্থাৎ শেকসপিয়রীয় পঞ্চাঙ্ক রীতির নাট্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই ধারার 'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯) নাটকটিকে তিনি বাস্তবানুগ করে তুলতে চেয়েছিলেন। যদিও কৃত্রিমতা ও অতিরঞ্জন দোষ এটিকে শেষমেষ পর্যবসিত করে মেলোড্রামায়। গীতিপ্রাণতাকে প্রতিহত করলেও গদ্যনাট্যে কাব্যের উচ্ছ্বাস রোধ করতেও ব্যর্থ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সমালোচককে উদ্ধৃত তিনি নিজেও স্বীকার করেছিলেন- "কেহ বলে 'ড্রামাটিক'/ বলা নাহি যায় ঠিক/ লীরিকের বড় বাড়াবাড়ি।"[২২] যদিও এই বর্গের 'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটকটি নিজ প্রসাদগুণে ভাস্বর। প্রথা ও হৃদয়ের দ্বন্দ্ব, চরিত্র ও ঘটনার সংঘাত ও শেকসপিয়র-সুলভ মানবচেতনা এখানে বহুলাংশে লক্ষিত হয়। এই বর্গের অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯), 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫) ও 'তপতী' (১৯২৯) উল্লেখযোগ্য।

উনিশ দশকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথের কলম থেকে উৎসারিত হয় অনেকগুলি কাব্যনাট্য ও নাট্যকবিতা – 'সতী' (১৮৯২), 'বিদায় অভিশাপ' (১৮৯৩), 'মালিনী' (১৮৯৬), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯৭), 'গান্ধারীর আবেদন' (১৮৯৭), 'নরকবাস' (১৮৯৭), 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' (১৮৯৭), 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' (১৯০০) ইত্যাদি। 'চিত্রাঙ্গদা' আলোচনাকালে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে উক্তিটি করেছেন, তা এই নাট্যবর্গের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির দ্যোতক-

> "নাটক যেন একটি অন্তর্গূঢ় মানস দ্বন্দ্বে অতৃপ্ত, প্রতি স্তরে নবোদ্ভিন্ন সংশয়-সন্দেহে বিভ্রান্ত, অপরিচ্য ও অর্ধপরিচয়ের আলো-আঁধারিতে অনিশ্চিত, প্রেমের পটভূমিকা প্রস্তুত করিয়া উহার রসনিষ্পত্তির দায়ি

> কাব্যের সুকুমার সৌন্দর্যসার-নির্মিত শিল্পের উপর ছাড়িয়া দিয়াছে। নাট্যসমস্যার প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব মৃদু বায়ুপ্রবাহের ন্যায় সৌন্দর্যসরসীর উপরিভাগকে মাঝে মধ্যে তরঙ্গিত করিয়াছে, উহার গভীরতায় কোন আলোড়ন জাগায় নাই। রূপমুগ্ধতার নিবিড় যোগসমাধি যেন রহিয়া রহিয়া নাটকীয় চিত্তবিহ্বলতার স্বপ্নঘোরে ঈষৎ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু উহার অবসান ও চরম পরিণতি আসিয়াছে নাটকীয় উপায়ে নহে, কাব্যোচিত স্বতঃউন্মীলনে।"[২৩]

আসলে, গীতিধর্ম ও ভাবতত্ত্বরূপায়ণের ঝোঁকে শেকসপিয়র-অতৃপ্ত কবি প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ঘটনাবিন্যাস-বিবর্জিত কাব্যালঙ্কার-শোভিত নাট্যবস্তু পরিবেশনে। তারই ফসল এই বর্গের নাটকগুলি।

প্রায় একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঝোঁকেন হাস্যরসাত্মক নাটকের প্রতি। এগুলি প্রহসন। কিন্তু একটু ভিন্ন প্রকৃতির। 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭), 'চিরকুমার সভা' (১৯২৬), 'শোধবোধ' (১৯২৬) ও 'শেষরক্ষা' (১৯২৮) – এগুলি কেবল জনচিত্তরঞ্জনকারী লঘু হাস্যরসাত্মক নাটক ছিল না। কিছু খামখেয়ালি চরিত্রের স্বভাবগত অসংগতিটিকে রবীন্দ্রনাথ এই সব নাটকে হাসির খোরাক করেছেন। কিন্তু তা হয়েছে মার্জিত ভাবে, নির্মল হাস্যরস পরিবেশনের মাধ্যমে।

তবে রবীন্দ্র নাট্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম ধারাটি হল তাঁর 'রূপক-সাংকেতিক' নাটকের ধারা। শাখাটির বিকাশ শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের 'গীতাঞ্জলি'-পর্বে। সমকালীন ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যের রূপক-সাংকেতিক ধারার প্রভাবে, বিশেষত বেলজিয়ান নাট্যকার মেটারলিংক ও নরওয়েজিয়ান নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের প্রতীকী নাট্যশৈলী ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রধান অনুপ্রেরণা। 'শারদোৎসব' (১৯০৮), 'রাজা' (১৯১০), 'ডাকঘর' (১৯১২),

'অচলায়তন' (১৯১২), 'ফাল্গুনী' (১৯১৬), 'মুক্তধারা' (১৯২২), 'রক্তকরবী' (১৯২৬) – এই বর্গের প্রধান নাটক।

এতদিন যে বৈশিষ্ট্যগুলি নানা বর্গে বিভক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের নানা নাটকে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই গীতিধর্মিতা, কাব্যশোভা, ঘটনাবিন্যাসের নৈপাট্য, ভাবতত্ত্বরূপায়ণ, চারিত্রিক দ্বন্দ্ব সবই এই নাটকগুলির মধ্যে দেখা দেয়।

বৌদ্ধ 'অবদান' সাহিত্যের একটি উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত 'রাজা' নাটকে কবি ব্যক্ত করেন অজস্র মোহজাল ছিন্ন করে পরমাত্মার অনুসন্ধানে মানবাত্মার অভিসার-কাহিনি। আবার 'ডাকঘর'-এ একই ভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মানবের অভিযাত্রার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানে মিলনের মাধ্যমটি হয়েছে মৃত্যু। 'শারদোৎসব' ও 'ফাল্গুনী' নাটকদু'টি বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবাত্মার অচ্ছেদ্য বন্ধনের স্বরূপটি নির্দেশিত হয়েছে। 'অচলায়তন' অনর্থক প্রথা-রীতিনীতি এবং অসার সংস্কারে আবদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের জেহাদ। এখানে কবি মুক্তমানস ও মুক্তজীবনের জয়গানে মুখর। অন্যদিকে 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'র উপজীব্য পদদলিত, লাঞ্ছিত, শৃঙ্খলিত জনতার মুক্তির সংকেতবার্তা।

নাট্যজীবনের সায়াহ্নবেলায় রবীন্দ্রনাথ মনোনিবেশ করে নৃত্যনাট্য রচনায়। এই নাটকগুলিতে নট-নটীর পরিবর্তের নর্তক-নর্তকীর ভূমিকা প্রধান। সংগীত-নৃত্য ও অভিনয়ের যুগলবন্ধী কিন্তু এগুলির নাট্যগুণ নষ্ট করেনি। 'নটীর পূজা' (১৯২৬) নাটকের নটীর নৃত্যে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের সূচনা। তাঁর নৃত্যনাট্য-ত্রয়ী 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৮) ও 'শ্যামা' (১৯৩৯) – নায়িকার জটিল হৃদয়দ্বন্দ্ব ও তৎপ্রসূত অপরাধের ভিত্তিভূমিতে দণ্ডায়মান চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব তথা মানসিক বিকাশের স্তরগুলিকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। এর

বিপরীতে নৃত্যনাট্য বর্গভুক্ত 'তাসের দেশ' (১৯৩৩) আসলে সমকালীন ভারতের প্রেক্ষাপটে একটি রাজনৈতিক রূপকনাট্য।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক জীবনের সংশয়-দ্বন্দ্বের পড়ে ভারতীয় সভ্যতার বিশিষ্ট মূল্যবোধ তথা অধ্যাত্মবিশ্বাসের সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন তাঁর নাটকে। নাটকের শৈলী ও বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি সারা জীবনই পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। বিদেশি নাটকের প্রভাব থাকলেও, তাঁর নাটক তাঁর ভাঙা গানের মতোই স্বকীয়তায় ভাস্বর। সমকালীন দর্শক সমাজের স্থূলরুচি এই দুর্জ্ঞেয় নাট্য আঙ্গিককে সম্যক অনুধাবনে ও গ্রহণে অপারগ ছিল। কিন্তু এই নাট্যচিন্তার অভিশ্রুতি ঘটে রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে বাংলা নাট্যমঞ্চের নবনাট্য আন্দোলন ধারাটির মাধ্যমে।

বিশ্ব শিল্পাঙ্গনে অনন্য সাধারণ এক প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাঁর সৃষ্টিকর্ম বিষয় বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তিতে যথার্থই মহাসমুদ্রের সঙ্গে তুলনীয়! রবীন্দ্র কীর্তির নানা মাত্রিক অত্যুজ্জ্বল সৃজন সম্ভারেও সম-দ্যুতিমান তাঁর রচিত নাটকসমূহ। অন্যদিকে, তাঁর নাটক প্রচলিত কোনো সৃজনধারার অনুসারী নয়, বরং এ ক্ষেত্রেও বিশ্বসাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা গৌরবের অধিকারী তিনি। আর রবীন্দ্রনাথ তো নাট্যকার মাত্রই নন, পাশাপাশি নাট্য প্রযোজনার বহুবিধ ব্যবহারিক কর্মের সঙ্গেও ছিলেন নিবিড় ভাবে সম্পৃক্ত। এখানেও তাঁর প্রতিভা বিরল-বহুমুখী, কারণ নাটক রচনায় উচ্চাঙ্গের সাফল্য অর্জনের সমান্তরালে তিনি ছিলেন সার্থক নাট্য নির্দেশক, নাট্য সমালোচক, নাট্য-অধিকর্তা, নাট্য-প্রশিক্ষক, নাট্য-অভিনেতা, মঞ্চ-সঙ্গীত-পোশাক-অঙ্গরচনা পরিকল্পক ও নেপথ্য নাট্যকুশলী।

সমকালে বা তৎপরবর্তী দীর্ঘকাল অবধি বাংলায় কোনো সাহিত্যিকের সাহিত্য সৃজনের পরিপূরক অনুরূপ ব্যবহারিক নাট্যতত্ত্ব প্রদানের দৃষ্টান্ত রিরল। এ ক্ষেত্রে তাঁর সার্থক উত্তর-সাধক নিশ্চিতই সেলিম আল দীন! উপরন্তু, প্রচলিত ধারা থেকে ভিন্নতর তত্ত্ব

ও প্রয়োগ ভাবনা এবং সে ভাবনার সমান্তরালে নাটক রচনা ও উপস্থাপন প্রচেষ্টার বিবেচনায় আধুনিক কালের নাট্যবিশেষজ্ঞগণ তাঁর নাট্যচর্চাকে 'ল্যাবরেটরি থিয়েটার' বা 'গবেষণাগার থিয়েটার'—এ ব্যবহারিক-ধারণার অধীন বলেই বিবেচনা করেন। বিশেষত, তাঁর নাট্যচর্চার প্রাথমিক পর্বের ('জোড়াসাঁকো পর্ব') পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ 'শান্তিনিকেতন পর্ব'র নাট্যচর্চাকে যৌক্তিক ভাবেই এ রীতির অন্তর্গত বলে অভিহিত করা যায়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘকালের নাট্যসংক্রান্ত ব্যবহারিক সংযুক্তি ও নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার বিবেচনায় তার নাট্যবিষয়ক মতামতসমূহ নিশ্চিতভাবেই রবীন্দ্রনাট্য উপস্থাপনায় আধুনিককালের নাট্য-নির্দেশকের নিকটে বিশেষ গুরুত্বে বিবেচ্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলায় রবীন্দ্রনাট্য নির্মাণের অধিকাংশ প্রয়াসেই এ সচেতনতা লক্ষ করা যায় না। বরং সিংহভাগ নির্দেশকই রবীন্দ্রনাকৃত নাট্যতত্ত্বের কথা বিস্মৃত হয়ে তাঁর নাটকসমূহকে প্রচলিত সাধারণ নাট্যকারের নাটকসম বিবেচনা করেই যেন নির্মাণকর্মে অগ্রসর হন। স্বভাবতই সেখানে রবীন্দ্রনাট্যের সঠিক ব্যবহারিক-উপস্থাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথকৃত সুচিন্তিত নাট্যভাবনার ফসল 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থের অন্তর্গত 'রঙ্গমঞ্চ' (১৩০৯ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধ, 'অন্তর বাহির' (১৩১৯ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধ, 'তপতী' নাটকের ভূমিকাসহ বিভিন্ন রচনায় এবং নানা আলোচনায় পাশ্চাত্যরীতির অনুকরণে তৎকালে প্রচলিত স্বভাববাদী-বাস্তববাদী (ন্যাচারালিস্টিক রিয়েলিস্টিক) দৃশ্যপট মঞ্চসজ্জার রীতি অভিনয় তথা উপস্থাপন রীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট অনাস্থা জানিয়েছেন এবং এর বিপরীতে অভিনেতা ও দর্শকের সহৃদয় অন্বয়সমৃদ্ধ, কাব্যরস নির্ভর ও কৃত্রিম মঞ্চসজ্জা বিবর্জিত নব্যকালের নাট্যরীতির স্বপক্ষে তাঁর আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। গভীর মনোযোগ সহকারে অনুসন্ধানের মাধ্যমে এর অভ্যন্তর দিয়েই প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ অভিপ্সীত রবীন্দ্রনাট্য-উপস্থাপনাশৈলীর সূত্রসমূহ লাভ করা যায়। রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনা নির্মাণের ক্ষেত্রে বর্তমানে তাই নির্দেশককে রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত নাট্যতত্ত্ব বা উপস্থাপনাশৈলী সতর্কতার বিশ্লেষণ এবং তার আলোকেই সৃজনপ্রয়াস পরিচালনা করা আবশ্যক। কারণ এর ব্যত্যয় ঘটলে রবীন্দ্রনাট্য উপস্থাপনার সঠিক রূপটি

অগোচরে থেকে যায়। বলা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যদর্শনের সমুন্নতি প্রত্যক্ষণে নাট্যবিষয়ে তাঁর গভীর অনুধ্যান, ঋদ্ধি, দূরদৃষ্টি ও আধুনিকতা অনুধাবনে যেমন আশ্চর্য হতে হয়; তেমনি গভীর আত্মনিবেশ সহকারে বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় যে, তাঁর নাট্যদর্শনের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে বাংলার সহস্র বৎসরের নাট্য-ঐতিহ্য বাংলা লোকনাট্যরীতির অন্তর্বৈশিষ্ট্যসমূহই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ বাংলার হাজার বছরের বাংলা শিল্পরীতির অমিয়ধারা মন্থনের মাধ্যমে বাঙালির সঠিক নাট্যরীতিসূত্র চিহ্নিতকরণে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই উপনিবেশ-উত্তর এ আধুনিককালে সহস্র বৎসরের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বাংলা লোকনাট্যরীতির যুগোপযোগী পরিশীলনের মাধ্যমে বাংলার নিজস্ব নাট্য-আঙ্গিক 'বাংলা নাট্যরীতি'-র সন্ধানে যখন নানাবিধ আন্তরিক উদ্যোগ অব্যাহত, তখন এ প্রয়াসে রবীন্দ্র-নাট্যদর্শন নিঃসন্দেহে বাঙালির জন্য যথার্থ পথনির্দেশকরূপে পরিগণিত হতে পারে।

চতুর্থ পর্ব : নাটক সাহিত্যের এক বলিষ্ঠ শাখা। সমাজের যথাযথ প্রতিচ্ছবি দর্শকের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে। সুতরাং নাটকের কাছে সামাজিক দর্শকের চাহিদা অনেক। সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে সাহিত্যের এই শাখাটি তাই সর্বাধিক আলোড়িত। কালের পরিবর্তনের ধারায় পালা বদলের হাওয়া এসে লাগে বাংলা নাট্য সাহিত্যেও। বাংলা নাটকের প্রথম ও মধ্যপর্বে পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, রোমান্স প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে রচিত অসংখ্য নাটকের 'পুণ্যের জয়, পাপের ক্ষয়'- এই ভাববোধ দর্শকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হতে থাকে। তাই তৃতীয় পর্বে তথা ১৯৪২ সালে সংগঠিত হয় 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' এবং ১৯৪৩ সালে গঠিত হয় 'গণনাট্য সংঘ'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পৃথিবীর অবক্ষয়, ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন, ১৯৪৩ সালের নরকতম মহামন্বন্তর (পঞ্চাশের মন্বন্তর) প্রভৃতি সমকালীন বিষয়কে কেন্দ্র করে 'গণনাট্য সংঘ' সূচনা করে 'নবনাট্য আন্দোলনের'। আর এই 'নবনাট্য

আন্দোলনের প্রথম পুরোহিত হলেন বিজন ভট্টাচার্য' (১৯১৫-১৯৭৮)। নবনাট্য আন্দোলনে তাঁরই নাটক 'নবান্ন' সর্বপ্রথম বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে। 'নবনাট্য আন্দোলনের' ধারায় তথা বাংলা নাট্য সাহিত্যের ধারায় বিজন ভট্টাচার্য এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। এ সম্পর্কে ড. অজিতকুমার ঘোষের বিশ্লেষণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> "বাংলাদেশের নবনাট্য আন্দোলনে যাঁহাদের দান সর্ব প্রথমেই শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয় তাঁহাদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য অন্যতম। অভিনয়, নাট্য-প্রযোজনা ও নাট্য রচনা বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তিনি তাঁহার প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। সুগভীর সমাজচেতনা এবং নাটকের মাধ্যমে প্রগতিমূলক চিন্তাধারা প্রসারের প্রচেষ্টাই তাঁহার সব নাটকে লক্ষ্য করা যায়।"[২৪]

বাংলা নাটকের পরিবর্তনের ধারায় চল্লিশের দশক (১৯৪০) থেকে বাংলা রঙ্গমঞ্চের জগতে এবং নাটক রচনার ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হয়। যে প্রয়াসের ফলে এই নবযুগের উদ্ভব তাকে নবনাট্য আন্দোলন নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই আন্দোলনের প্রথম উদ্যোক্তা ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। তাই প্রথম দিকে নবনাট্য আন্দোলন গণনাট্য আন্দোলন নামেই খ্যাত ছিল। শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে এতদিন প্রতিবাদী চিন্তা যে ছিলো না তা নয়, কিন্তু শ্রমিক শ্রেণির অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থকে সামনে রেখে সচেতনভাবে শিল্প ও সাহিত্য কর্মে আত্মনিয়োগের প্রয়াস ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। এই বিশেষত্ব একদিককার চিত্র। অন্যদিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও তার প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষ তথা বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি অন্য একদিকের চিত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-উত্তরকালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছিল। জনগণের ওপর ক্রমাগতই নেমে আসছিল অবর্ণনীয় নির্যাতন। বিনা বিচারে আটক, হিজলী

জেলের মধ্যে গুলি করে হত্যা, সভা সমাবেশে হামলা করে বন্ধ করে দেওয়া, শাসক গোষ্ঠীর এরকম নির্যাতনমূলক আচরণ জনগণকে আতঙ্কিত করার পাশাপাশি প্রতিবাদীও করে তুলেছিল। জাতীয়তাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি জাগ্রত হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক চেতনা। ১৯২২ সালে ইতালিতে এবং ১৯৩৩ সালে জার্মানীতে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ফ্যাসিবাদের আক্রমণ জাতীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি, ফ্যাসিবাদীরা অপর জাতি ও দেশকে আক্রমণ করতে শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ফ্যাসিবাদী জার্মানের পরদেশ আক্রমণ ও দখলের বেপরোয়া জঙ্গীনীতি থেকেই শুরু হয়। তবে ১৯৩৫ সাল থেকেই ইউরোপে ফ্যাসিবাদী আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইতালি ফ্যাসিস্ট মুসোলিনির নেতৃত্বে স্পেনের উপর হামলা শুরু করে। পাবলো পিকাসোর মতো শিল্পী তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছেন, 'গোর্নিকা'র মতো ছবি এঁকে। ১৯৩৬-এর ৩ সেপ্টেম্বর রোমাঁ রল্যাঁ, গোর্কি, বারবুস, আইনস্টাইন, আদ্রে জিঁদ, স্ট্রাচি প্রমুখের আহ্বানে ব্রাসেলস শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে AIPWA-এর পক্ষ থেকে যে ঘোষণা বার্তা প্রেরণ করা হয় তাতে বলা হলো - পৃথিবীর সম্মুখে আজ আতঙ্কের মতো আর এক বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা সমুপস্থিত। ফ্যাসিস্ট স্বৈরতন্ত্র মাখনের বদলে কামান তৈরিতে মগ্ন। তারা সংস্কৃতির বিকাশের বদলে বিকশিত করছে সাম্রাজ্য জয়ের উন্মাদ লালসা, প্রকাশ করছে নিজের হিংস্র সামরিক স্বরূপকে। ফ্যাসিজমের নৃশংসতা ও বর্বরতার প্রতিবাদে বিশ্বমানসকে সচেতন করার উদ্দেশ্যেই ছিল এই আয়োজন।

১৯৪৩ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘকে সর্বভারতীয় সংগঠনে পরিণত করা হয়। যার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন কায়ফি আজমী, শান্তি বর্ধন, প্রেমধাবন, বলরাজ সাহনী, শংকর শৈলেন্দ্র, পৃথ্বিরাজ কাপুর, অমর শেখ প্রমুখ। আর বাংলার প্রাদেশিক কমিটিতে মনোনীত হন সুনীল চ্যাটার্জী, দিলীপ রায়, সুধীপ্রধান, বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, সুজাতা মুখার্জী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, স্নেহাংশু আচার্য, বিষ্ণু দে, বিনয় রায় প্রমুখ। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের

নানাবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে নাটক ও মঞ্চের লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছিল যে, তৎকালীন বিশ্বপরিস্থিতির পটভূমিকায় নাট্যের মাধ্যমে মানুষের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, শোষণের বিরুদ্ধে শৈল্পিক প্রতিবাদ। এ কারণেই গণনাট্য আন্দোলন 'Art for arts sake' বা 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই নীতি দ্বারা পরিচালিত নয়; 'Art for humans sake' বা 'জীবনের জন্য শিল্প' এই নীতিতেই পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন গণনাট্য আন্দোলনকারীরা। উপযোগবাদী এই নাট্যকারগণ সর্বতভাবে চেষ্টা করেছিলেন, এই জীবনকে কীভাবে হতাশা-বঞ্চনা, দুঃখ-দুর্দশা ও পরাজয়ের পথ থেকে মুক্ত করে একটি সুস্থ সমাজবাদী অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সমুত্তীর্ণ করা যায়। 'গণনাট্য-আন্দোলন' শব্দটি একটি বিশেষ সময়ের সন্ধিক্ষণের দলিল। যখন বাংলা নাট্য-মঞ্চের পরিবেশের গতানুগতিকতা বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। সেই মুমূর্ষু নাট্যাঙ্গনে একরাশ তাজা বাতাসের সুগন্ধ নিয়ে এসেছিল এই আন্দোলন। গণনাট্যের অর্থ শুধু জনতা বা গণের নাটক নয়, সেই সঙ্গে একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক তথা নাট্য আন্দোলনও বটে। চল্লিশের দশকের শুরুতে এক টালমাটাল পরিস্থিতিতে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উদ্ভব। 'জবানবন্দী', 'হোমিওপ্যাথি', 'ল্যাবরেটরী', বা 'আগুন' ইত্যাদি একাঙ্ক নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যার সূচনা, নানা গান ও নাচের দলের পাশাপাশি নাট্যদলের 'নবান্ন' নাটক প্রযোজনার মধ্য দিয়ে ইতিহাস স্থাপিত হয় । ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর শ্রীরঙ্গম (বর্তমানে বিশ্বরূপা) রঙ্গমঞ্চে বিজন ভট্টাচার্যের লেখা 'নবান্ন' নাটকাভিনয়ের মধ্যেই এই আন্দোলনের প্রথম প্রতিষ্ঠা, যার প্রযোজনায় ছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। এই পর্ব থেকেই গণনাট্য আন্দোলন বিশেষভাবে কল্লোলিত হয়ে উঠতে থাকে। বাংলা নাটকের ইতিহাসে গণণাট্য বা নবনাট্য আন্দোলন একদিনে গড়ে ওঠেনি। বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যুগান্তকারী নানা ঘটনা-সংঘাতের ধারাবাহিকতাকে তিল তিল করে সঞ্চিত করে তবেই এই আন্দোলনের উৎপত্তি হয়েছে।

গণনাট্য আন্দোলনের প্রাক-প্রেক্ষাপট বিচার সাপেক্ষে বাংলা নাটকের ধারাবাহিকতা আলোচনা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি যে, রঙ্গমঞ্চের হাত ধরে বাংলা নাটকের উৎপত্তি হয়েছে। বাংলায় প্রথম রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল ১৭৯৫ সালে, যার নাম ছিল 'Bengally theatre' এবং এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রুশ নাগরিক হেরাসিম লেবেডেফ (১৭৪৯-১৮১৮)। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে তাই এই বছরটি যুগান্তকারী এবং হেরাসিম লেবেডেফ অবিস্মরণীয় এক নাম। কেননা এই বছরে হেরাসিম লেবেডেফ-এর প্রতিষ্ঠিত 'Bengally theatre'-এ যে ইংরেজি প্রসহন দুটির বাংলা অনুবাদ অভিনীত হয়েছিল তার থেকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত হতে হতে আধুনিক বাংলা নাটকের বিকাশ সাধিত হয়। অহীন্দ্র চৌধুরী এই ঘটনাকে তৎকালীন সামাজিক বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করে লিখেছেন, '১৭৯৫ সালের কথা 'দি ডিজগাইজ' এবং 'লাভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর' এই দুখানি প্রহসন জাতীয় নাট্যাভিনয় দিয়ে শুরু হয়েছিল বাঙলা থিয়েটারের প্রথম পদক্ষেপ।'

এই ঘটনার পর ক্রমবিকাশের ধারায় বাংলা নাটক অনুবাদ পর্ব পেরিয়ে পৌঁছে মৌলিক নাটকের সোপানে। বাংলা নাটকের এ পর্বকে যিনি একক প্রচেষ্টায় ঋদ্ধ করেছিলেন, তিনি হলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬)। তিনি অনুবাদ নাটকের পাশাপাশি কিছু মৌলিক নাটক ও প্রহসন রচনা করেছেন। তাঁর রচিত মৌলিক নাটকের মধ্যে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪), 'যবননাটক' (১৮৬৫) উল্লেখযোগ্য এবং এই 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটিই বাংলার প্রথম সমাজ সচেতন নাটক। তৎকালীন বাঙালি সমাজের কুসংস্কার কৌলীন্যপ্রথা ও তার অভিশাপের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদের হাতিয়ার ছিল এই নাটকটি। এ সম্পর্কে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটককে বাংলার সর্বপ্রথম সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবন ভিত্তিক এক দুঃসাহসিক সামাজিক রচনা বলে উল্লেখ করেছেন।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের পর্বে সামাজিক সমস্যার প্রতিফলন প্রথম সূচিত হয়েছিল এই নাটকে। সেদিক থেকে বলা যায়, বাংলার নবনাট্য আন্দোলনের বীজ এর মধ্যেই সুপ্ত ছিল। এরপর বাংলা নাট্য সাহিত্যের বিকাশ পর্বের সূচনা মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) ও দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) হাতে। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে বাঙালি সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের যে বীজ নিহিত ছিল, তারই ধারাবাহিকতায় মধুসূদন রচনা করলেন 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) প্রহসন দুটি। প্রহসন দুটিতে তিনি সমসাময়িক সমাজ-জীবনের নানা সংস্কার, অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছেন। সমসাময়িককালে আরেকটি নাটক নীলকরদের বিরুদ্ধে বাঙালি কৃষকদের জোট প্রতিরোধের দলিল হিসেবে কাজ করে। দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) এই 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকেই প্রথম গণসচেতনতা প্রতিফলিত হয়।

বাংলায় গণনাট্য আন্দোলন বা নবনাট্য আন্দোলন প্রসার লাভ করেছিল বিশ শতকের চল্লিশের দশকে। আর 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) এ নাট্য আন্দোলনের প্রায় একশ' বছর পূর্বে রচিত হয়েও যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা নবনাট্য আন্দোলনের পথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকটি যে আধুনিক বাংলার গণনাট্য বা নবনাট্য আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বলা বাহুল্য যে, তখনও পাশ্চাত্য সাহিত্যে নবনাট্য আন্দোলনের সূচনা হয়নি। শেক্সপিয়রীয় যুগের পাশ্চাত্য নাটকের অভিজাত শ্রেণির মানুষকে ছেড়ে নাট্য সাহিত্যে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের জীবনবোধ নিয়ে আবির্ভূত হন ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬)। তাঁর রচিত 'গোস্টস' (Ghosts) নাটকটি ইউরোপীয় চিরাচরিত প্রথাকে উপেক্ষা করে নিতান্ত পরিচিত জীবন ও সত্য ভাষণের দুঃসাহসিকতা নিয়ে এসে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। Ghosts নাটকটি ১৮৮১ সালে প্রকাশিত হয়ে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ইবসেনের নাটক বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করলেও, তখনও ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যে নিতান্ত সাধারণ বস্তি জীবনের দুঃখ দুর্দশা বিষয়

চিত্রিত হতে শুরু করেনি। কেননা, ইবসেন যে মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনের বিষয় অবলম্বনে নাটক রচনা করেছেন, সেই মধ্যবিত্ত সমাজ শেক্সপিয়রের অভিজাত শ্রেণির মাত্র একধাপ নিচের স্তর। কিন্তু তারও নিচের স্তরের বা সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে মানুষের জীবনকে চিত্রিত করেছেন ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬) তাঁর নাটকে।

গণমুখী জীবন চেতনা নিয়ে নাটক রচনা করে বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) রচনা করেছিলেন 'জমিদার-দর্পণ' (১৮৭৩) এবং দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন 'চা-কর দর্পণ' (১৮৭৫) নাটক দুটি। বাংলা নাটকে যখন শৈশব ও কৈশোর অতিক্রান্ত করে যৌবনের সূচনা দেখা দিয়েছে, ঠিক সেইসময় নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১) তাঁর বিপুল প্রতিভা নিয়ে নাট্যাঙ্গনে হাজির হন। তাঁরই নেতৃত্বে ১৮৭২ সালের ডিসেম্বরে বাংলায় সর্বপ্রথম পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর প্রতিষ্ঠা হয়। এরই ফলে সমাজে তথা নাট্য সাহিত্যে গণমুখী চেতনার সৃষ্টি হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষের সমসাময়িক কালে ইতিহাস ও সমাজকে অবলম্বন করে নাটক রচনা করেছিলেন অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)। স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে যুগ ও জাতির যথার্থ আত্মজিজ্ঞাসাকে নাটকে রূপায়িত করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)। সমসাময়িক কালে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) তাঁর নাটকে জাতীয় চেতনাকে সমাকালীন যুগরুচি ও চাহিদার সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। এরপর রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) হাতে বাংলা নাট্যভাণ্ডার পূর্ণতা পায়। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে এর পরের উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল বাংলা নাটকে গণনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত।

১৯৪১ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদিকা সিংহলী কন্যা অনিলা ডি সিলভা ব্যাঙ্গালোরে 'জননাট্য' নামে একটি নতুন নাট্য সংগঠন গড়ে তোলেন। পরে এই 'জননাট্যই' গণনাট্যে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে গণনাট্য সংঘের প্রথম আনুষ্ঠানিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বোম্বাইয়ের মারোয়াড়ী বিদ্যালয় গৃহে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ আমাদের নাট্য আন্দোলনের মরা গাঙে জোয়ার এনেছিল। চল্লিশের দশকের এই নাট্য আন্দোলন আমাদের নাট্য-প্রেক্ষাপটে এনেছে সাম্যবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রত্যক্ষ প্রভাব। সেই সঙ্গে ঐতিহ্যবোধ ও আধুনিকতা। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হয় এবং ১৯৪৮ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির উপর আবার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। গণনাট্য আন্দোলনকারী কমিউনিস্ট কর্মীরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেন। ফলে গণনাট্য আন্দোলনও কিছুটা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। গণনাট্য আন্দোলনের ঐ ক্ষীণ দীপ্তির কালে গণনাট্য সংঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রথমে যে দলটি পৃথক নাট্য প্রযোজনায় ব্রতী হয়ে নতুনতর নাট্য আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল সে দলটির নাম 'বহুরূপী' (১৯৪৮), নবনাট্যেরও সূচনাপর্ব সেই সময়কাল থেকেই। গ্রুপ থিয়েটার এই নবনাট্য আন্দোলনের দ্বারা পরিপুষ্ট। কালক্রমে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত নানা গ্রুপ থিয়েটারের পাশাপাশি বাদল সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত থার্ড থিয়েটার, পথ নাটক প্রভৃতি। এই সময়কালেই বাংলা নাট্য আন্দোলনের ধারায় বিস্তার লাভ করে অ্যাবসার্ড নাটক।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা বলা চলে যে, বাংলা নাটকের সুদীর্ঘ ইতিহাস নদীর স্রোতের ন্যায় বার বার গতিমুখ পরিবর্তন করেছে। কালের অগ্রগতিতে সমাজ ও সামাজিক জীবনের পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে সাহিত্যের প্রত্যক্ষ মাধ্যম নাটকের উপর। কালের প্রেক্ষিতে পরিবর্তনের প্রভাবকে আত্তীকরণ করেই বিভিন্ন কালে নাটকের স্রষ্টাগণ তাঁদের জীবনদর্শনকে দর্শক সমক্ষে তুলে ধরেছেন। তাঁরা

সমাজ ও সামাজিক জীবনের কল্যাণ সাধনের হাতিয়ার হিসেবে অন্যান্য সাহিত্য সংরূপের ন্যায় নাটককেও প্রাধান্য দিয়েছিলেন। মানব জীবন ও সমাজ জীবনকে স্পষ্টরূপে তুলে ধরতে প্রহসন, পূর্ণাঙ্গ নাটক, একাঙ্ক, অণুনাটক প্রভৃতি নাট্য আঙ্গিকের পাশাপাশি সামাজিক, ঐতিহাসিক, ভক্তিমূলক পৌরাণিক, জীবনীমূলক, রাজনৈতিক নাটক রচিত হয়েছে। কখনো কখনো রূপক, সাংকেতিক তত্ত্বের পাশাপাশি পাশ্চাত্যের অ্যাবসার্ড, ম্যাজিক রিয়ালিজম, পরাবাস্তববাদ, ব্ল্যাক কমেডি প্রভৃতি তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছেন নাট্যকারগণ। এভাবেই বাংলা নাটক বহুমুখী ধারায় কালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে নিজস্ব গতিতে।

তথ্যসূত্র

১। ঘোষ, ড. অজিতকুমার : বাংলা নাটকের ইতিহাস, জানুয়ারি ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা - ১।

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, ২য় খণ্ড , ৫ম সংস্করণ , ফাল্গুন ১৪১১, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা – ৭০০০০৭, পৃষ্ঠা - ২৬।

৩। ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অক্টোবর ২০১০, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭৩, পৃষ্ঠা - ৮১।

৪। তদেব, পৃষ্ঠা – ৮৩

৫। ঘোষ, ড. অজিতকুমার : বাংলা নাটকের ইতিহাস, জানুয়ারি ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা - ৫৭।

৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, ১৯৯৯, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা – ৭০০০০৭, পৃষ্ঠা - ৩৪।

৭। ঘোষ, ড. অজিতকুমার : বাংলা নাটকের ইতিহাস, জানুয়ারি ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা - ৭১।

৮। মৈত্র, সুরেশচন্দ্র : বাংলা নাটকের বিবর্তন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ২০১০, রত্নাবলী, কলকাতা - ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা – ২১৬।

৯। তদেব, পৃষ্ঠা – ৩০০।

১০। মিত্র, দীনবন্ধু : দীনবন্ধু রচনাবলী, বৈশাখ ১৪০৪, কামিনী প্রকাশনী, কলকাতা -৭৩, পৃষ্ঠা – ৫৩।

১১। ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অক্টোবর ২০১০, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭৩, পৃষ্ঠা - ২৪১।

১২। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৫১।

১২। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৬৪।

১৩। ঘোষ, ড. অজিতকুমার : বাংলা নাটকের ইতিহাস, জানুয়ারি ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা - ১২৪।

১৪। তদেব।

১৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৪৪।

১৬। তদেব, পৃষ্ঠা – ১৪৫।

১৭। দত্ত, উৎপল: গিরিশ মানস; ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৮; এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ; কলিকাতা -৭৩; পৃষ্ঠা – ১ - ২।

১৮। সেন, ড. সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ৩য় খণ্ড, ২০০০, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ০৪, পৃষ্ঠা - ৩৮০

১৯। ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, অক্টোবর ১৯৬১, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭৩, পৃষ্ঠা - ২৩২।

২০। ঘোষ, ড. অজিতকুমার : বাংলা নাটকের ইতিহাস, জানুয়ারি ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা - ২৩৭।

২১। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৪২।

২২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, মাঘ ১৪০৬, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা - ১৭, পৃষ্ঠা – ২৫৮।

২৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, বৈশাখ ১৪১৭ , পৃষ্ঠা – ১৮১।

২৪। ঘোষ, ড. অজিতকুমার : বাংলা নাটকের ইতিহাস, জানুয়ারি ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা - ৩৭১।